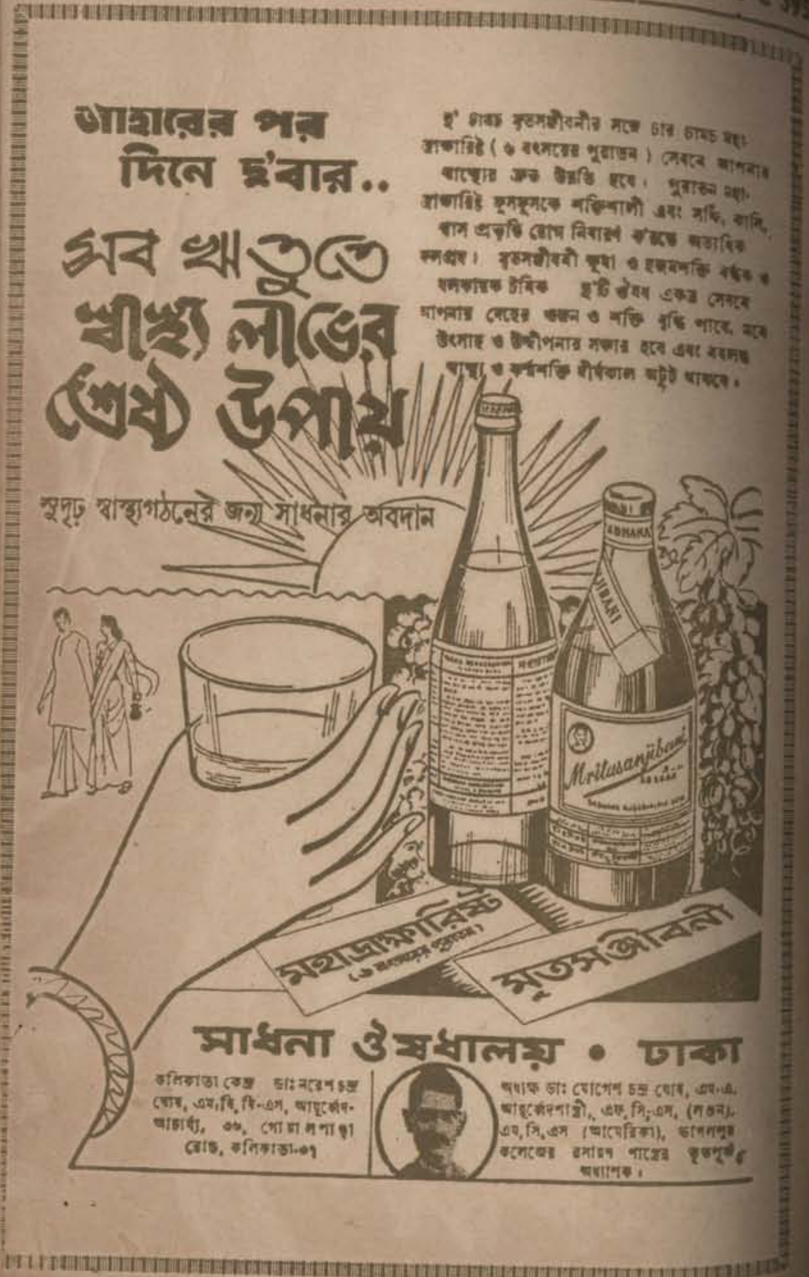


অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

পরিচয়



নিয়মাবলী

- পরিচয় মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণ মাসে বর্ষারম্ভ যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৮ টাকা, ষান্মাসিক ৪ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।
- রচনা ও এতৎবিষয়ক চিঠিপত্র সর্বক্ষেত্রে সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে চিঠির উত্তর ও অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদকীয় দপ্তর তিন মাসের বেশি অমনোনীত পাণ্ডুলিপির জন্য দায়ী থাকবেন না।
- টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য: ম্যানেজার, পরিচয়, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭।

রূপকথার রাজকুমারী





মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে্‌ জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তারপর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো। সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি ওঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার কাছে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুণ—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?



"ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো, এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ হল নাকি, এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস।" মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রক্‌টা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।

ফ্রক্‌টা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রক্‌টাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি?" "এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো," কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"



আমি বললাম "না আছ্‌ড়ালেই বা কাচবো কি করে।" "আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামাকাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয়না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দ্যথ্‌ একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে একগাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে্‌ করে! এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্ব্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তক্ষুনি আমি একটা সান লাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তূপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে্‌ হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্‌ পরিয়ে দিলাম।



হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই

সূচীপত্র

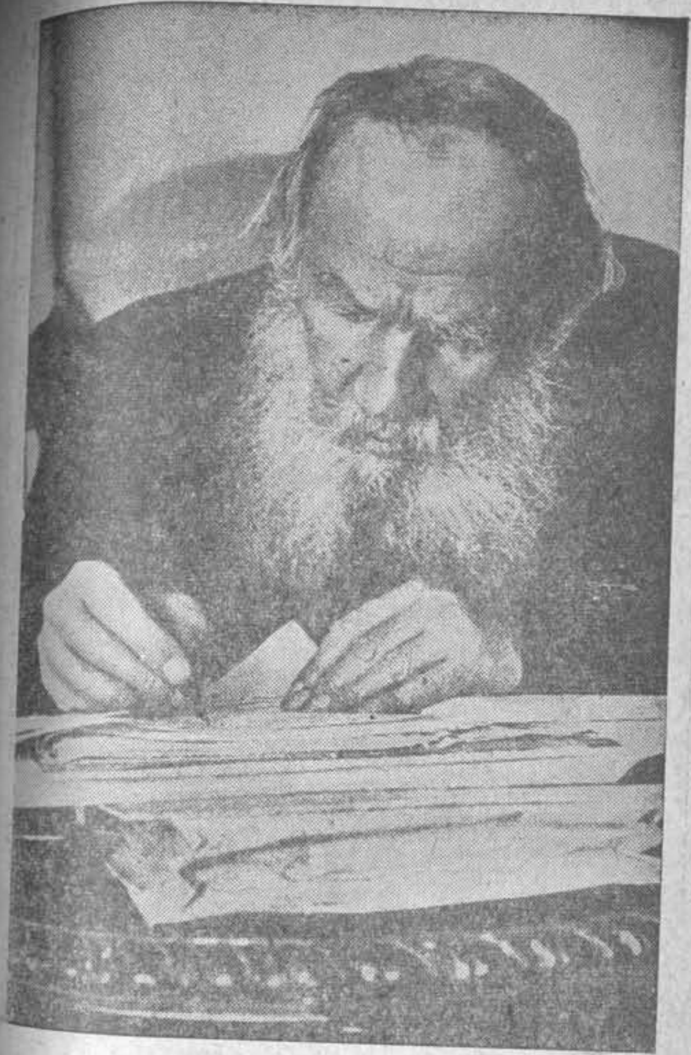
অগ্রহায়ণ সংখ্যা

টলস্টয়ের ছবির ব্লকটি 'সোভিয়েত দেশ'-এর সৌজন্যে

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



লিও টলস্টয়
১৯০৮

জন্ম : ১৮২৮ মৃত্যু : ১৯১০

পরিচয়
৩০ বর্ষ; ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ; ১৩৬৭

টলস্টয়

গোপাল হালদার

শ বৎসর পূর্বে (৭ই নভেম্বর, ১৯১০ ইং) কাউন্ট লিও টলস্টয়ের মৃত্যু া। কালের পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাঁকে দেখা সুসঙ্গত। ইতিহাস তারপরে ভাবে রূপায়িত হয়েছে তাতে তাঁর স্বদেশে ও বিদেশে আজ ইতিহাসে স্টয়ের ভূমিকা অনুধাবন করাও অসাধ্য নয়।

টলস্টয়ের দেশে ইতিহাসের সেই প্রকাশ ১৯১৭-এর বিপ্লবের পর থেকে ষ্ট। পৃথিবীতে তখন থেকেই কালান্তরের প্রকাশ্য সূচনা হয়। রুশ দেশের রে যে সব দেশে টলস্টয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, তার মধ্যে রত ভারতবর্ষই প্রধান উল্লেখযোগ্য। সেখানে ইতিহাসের রূপান্তর নো আকস্মিক বিপ্লবের দ্বারা সাধিত হয় নি। ১৯৪৭ এর রাষ্ট্র ক্ষমতা ান্তরের মধ্যে তা কতকাংশে অনুস্যূত ছিল। ১৯৫০এ ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্র নৈতিক পরিকল্পনার পন্থা গ্রহণ করায় কার্যত গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ্যের' পরিত্যক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে টলস্টয়ের খ্রীষ্টীয় নৈরাজ্যনীতি 'কৃষক-সাম্যনীতি'ও (এগ্রেরিয়ান্ সোশ্যালিজম্) অগ্রাহ্য হয়েছে। পি কী স্বদেশে কী বিদেশে যা লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা এই যে— য়ের মতবাদ অগ্রাহ্য হলেও ইতিহাস কোনো দেশেই টলস্টয়কে অগ্রাহ্য তে পারে না। দুই দিক থেকেই টলস্টয় ইতিহাসের সহায়ক। প্রথমত, বিপ্লবী রুশ সমাজে টলস্টয় শাসন ও শোষণের অন্যায়কে উৎপাটিত র জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং মানুষের চিত্তের ন্যায়বোধকে সেই সূত্রে ও প্রদীপ্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত টলস্টয় এই সন্ধিক্ষণের রুশ নের চিত্র যে সত্যনিষ্ঠায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে দেশের মানুষের কাছেই সেই সমাজ-সত্য ও জীবন-সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে

আছে। ইতিহাস টলস্টয়ের সাহিত্য-স্বষ্টিতে যেমন রূপায়িত তেমনি প্রাণ-পরিপুষ্ট।

স্বদেশে স্ব-কালে

লিও টলস্টয় জন্মেছিলেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক রুশ জমিদার পরিবারে। তখনো রুশ দেশে ভূমিদাস প্রথা স্বপ্রচলিত—আরও প্রায় ৩৩ বৎসর পরে (১৮৬১) ভূমিদাসরা রুশদেশে মুক্তিলাভ করে। তখন টলস্টয় পরিণত-চিত্ত পুরুষ, তাঁর মন প্রায় তাঁর মতের নিশানাও তখনই আবিষ্কার করছে। না করে উপায় ছিল না। কারণ, সে শতাব্দীর স্বচনা থেকেই পুশকিন, গগল ও ক্রমে বেলিন্স্কি, চানিশেভস্কি, হার্ৎসেন প্রমুখ প্রতিভাধরগণ সে দেশে আবির্ভূত হলেন। রুশ সমাজ ও রুশ মানসে তাঁরা যে ভাব-বিপ্লবের স্বচনা করলেন গোটা উনবিংশ শতাব্দী তাতে রুশ দেশের ইতিহাসের এক মহা লগ্ন হয়ে উঠল। রুশ চিন্তাধারার এই সত্যটা স্মরণে রাখলেই রুশ বিপ্লবের পটভূমিকে চেনা যায়। টলস্টয়ের বাল্য ও যৌবন সেই আলোড়নের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়, আর তাঁর কর্মজীবন সেই শতাব্দীর সাধনাকে নিজস্ব দানে মহাপরিণতির দিকে অগ্রসর করে দেয়। বাল্যে তাঁর চতুর্দিকে টলস্টয় দেখেছিলেন সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশ বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ। উদার রুশ ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে তাঁদের স্বপ্ন সফল হবে, এই ছিল বুদ্ধিজীবীদের আশা। টলস্টয়ের মন কিছুমাত্র এই স্বপ্নে সাড়া দিত না। খ্রীঃ ১৮৬১ এর পরে রুশ ধনতন্ত্র যেভাবে ক্রমশ উদ্ভূত হতে লাগল তাতে উদারতন্ত্রীদের স্বপ্ন চূর্ণিত হয়ে গেল। টলস্টয় কিন্তু বিন্দুমাত্রও দুঃখিত বা বিস্মিত হলেন না; তাঁর আপন মতবাদ তিনি বরং তখন আবিষ্কার করে চললেন প্রধানত সাহিত্য স্বষ্টির মধ্য দিয়ে। ইং ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রতিভা সাহিত্যিক প্রকাশকেই প্রাধান্য দিয়েছে;—স্বষ্টির নিয়মকে মেনে মতবাদ নিজেকে প্রকাশিত করতে তখনো কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু ইং ১৮৮০ থেকে তিনি প্রকাশের অপেক্ষাও প্রচারকেই প্রাধান্য দিলেন। তাঁর 'আত্মস্বীকৃতি' (ইং ১৮৮০-৮২) থেকেই এ জীবনার্ধের প্রারম্ভ। কিন্তু প্রকাশ গুণ তখনো টলস্টয় একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। প্রচার ও প্রকাশের ফলেই যে প্রবলতর শক্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়—শত সত্ত্বেও প্রকাশ-ধর্ম তাঁকে সেই পর্বেও নিষ্কৃতি দেয় নি। প্রথমার্ধে যেমন তিনি লিখেছেন 'কসাক'

(লেখা ১৮৫৪) থেকে 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ইং ১৮৬৩-৬৯) ও আনা কারেনিনার (ইং ১৮৭৫-৭৭) বিশ্ব বিশ্রুত সাহিত্য, দ্বিতীয়ার্ধেও তিনি শুধু 'স্বীকৃতি'র পরে 'আমি কী বিশ্বাস করি' (১৮৮৪), 'কী তা হলে কর্তব্য' (১৮৮৬), 'জীবন-প্রসঙ্গে' (১৮৮৭), 'ভাগবত রাজ্য তোমারই অন্তরে' (১৮৯৩), 'আমাদের কালের দাস-প্রথা' (১৯০০), 'ধর্ম কী' (১৯০২) প্রভৃতি প্রচার পুস্তিকাই লেখেন নি। সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন, 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' (১৮৮৬), 'প্রভু ও ভৃত্য' (১৮৯৫), 'হাজি মুরাদ' (১৯০১-'৪), 'জাল রসিদ' (১৯০৩-'৫) ও 'উপকথা'র মতো নীতিগল্পমালা; লিখেছেন 'পুনর্জীবনের' (১৮৯৯), 'ক্রয়ৎসার সনাটার' (১৮৮৭-৮৯) মতো অমর উপন্যাস, আর 'আঁধারের প্রতাপ' (১৮৮৬), 'আলোকপ্রাপ্তির ফল' (১৮৮৯), 'জীবন্ত শব' (১৯০০) প্রভৃতি অসামান্য নাটক। প্রথমার্ধেও 'যুদ্ধ ও শান্তি'র প্রিন্স এন্দ্রু ও পিয়ের-এর কোনো কোনো বক্তব্য ও চিন্তা পাঠকের চক্ষে পড়ে। কারাতিয়েফ-এর মত কৃষক চরিত্র ভুলবারও উপায় নেই। আর 'আনা কারেনিনায়' আনা ও ভ্রনস্কির অপেক্ষা লেভিন ও তাঁর কৃষি-সংস্কারের পরীক্ষা লেখকের নিকট যে কম গুরুতর নয়, সাধারণ পাঠকও তা বিরক্তির সহিতই মানতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ার্ধে যে টলস্টয় শিল্পকলাকে প্রায় নস্যাৎ করতে চেয়েছেন—'শিল্প কী' প্রভৃতি পুস্তিকায়, তাঁর প্রচার পুস্তিকাতেও দেখা যায় তাঁর প্রচার জীবন্ত হয়েছে প্রকাশের গুণে। সেই কারণেই টলস্টয়ের গল্প উপন্যাস নাটক কেন, তাঁর ডায়ারি পত্রাবলী সমেত তাঁর ৯০ খানির মতো রচনা-ভারের কোনোটিই পাঠকের অবজ্ঞেয় নয়।

সত্তার স্ববিরোধ: প্রাণাবেগ বনাম নীতিবোধ

আনুপূর্বিক টলস্টয়ের সাহিত্য যাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা সকলেই একমত যে, টলস্টয়ের জীবনের প্রথমার্ধ ও শেষার্ধ দুটি বিচ্ছিন্ন পর্ব নয়। বরং একই টলস্টয় প্রকাশ-ধর্ম ও প্রচার-ধর্ম এই দ্বৈত ধর্মের আধার, এ কথা বলা চলে। কিন্তু তাও যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের মূল রূপটি নির্দেশ করা সে জন্য প্রয়োজন। কারণ, টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব জটিল, আর তাঁর প্রতিভা সেই জটিল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর-বাহী। এমন কি এই কারণে অনেক বিচক্ষণ সাহিত্য-রসিকেরও মনে হয়—'যুদ্ধ ও শান্তি' ও 'আনা কারেনিনা'র মতো টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ স্বষ্টিতেও শিল্পগত সুসংহতির অভাব রয়েছে। ("what

do such large loose baggy monsters···artistically mean ?" Henry James). অবশ্য টলস্টয়ের প্রতিভার গভীরতর প্রদেশে পৌছলে সে সংশয় দূর হয়। প্রতিভার সে বৈশিষ্ট্য বুঝবার জন্য সেই ব্যক্তি-স্বরূপের সঙ্গে সাধারণ পরিচয় প্রয়োজন। কী সেই সাধারণ পরিচয় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের ?

সরল ভাষায় বলা যায়—টলস্টয়ের ব্যক্তিসত্তা দুটি বিরোধী শক্তির সংযোগে গঠিত। তাঁর জীবন এক দ্বৈরথ যুদ্ধের সংগ্রামক্ষেত্র। একটিকে বলতে পারি প্রাকৃত প্রাণস্ফূর্তি, অন্যটিকে আত্ম-পরীক্ষা ও ধর্মবোধ। মাটি জল আলো আকাশের গড়া এই বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জীব-প্রকৃতি সমসূত্রে গ্রথিত। টলস্টয়ও এক দিকে প্রকৃতির সঙ্গে সেইরূপ একাত্মতায় প্রবল ও সেরূপ জৈব-প্রাণধর্মে দুর্বার। এটি প্রাকৃত প্রাণস্ফূর্তির দিক। দৈহিক উদ্যমে, পরিশ্রমে, যৌন-কামনায় এই বলিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে প্রাণাবেগ অশান্ত উল্লাসে স্বতঃস্ফূর্ত। টলস্টয়ের পাঠকমাত্রই টলস্টয়ের সাহিত্যে, ডায়ারিতে, চিঠিপত্রে বারবার এই প্রাকৃতধর্মের পরিচয় দেখতে পান।

কথাটা স্পষ্ট করবার জন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে দু-একটি এরূপ দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করছি।—'কসাক' গল্পটির নায়ক ওলিনিনের প্রসিদ্ধ শিকার কাহিনীটি এই প্রাকৃত প্রাণবোধের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। খণ্ডিত আকারেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি —তাতে রস অসম্পূর্ণ থাকবে, বিষয়টি কোনোক্রমে বোঝা সম্ভব হবে। শিকারের হরিণটির চিহ্ন ওলিনিনের চারিদিকে সেই গুহায়। পার্শ্বে শিকার করা রক্তাক্ত পাখিগুলো। ওলিনিন-এর স্বগতোক্তি : "আমার চারদিকে ডাঁশ উড়ছে—গাছের পাতাগুলোর মধ্য দিয়ে তারা উড়ে যেতে যেতে মনে করে পাতাগুলো যেন কোন্ সমুদ্রের দ্বীপ। হাওয়ায় উড়ছে আর ভন্ ভন্ শব্দ তুলেছে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে,—এক শত, এক হাজার, এক লক্ষ ;—প্রতিটিই ভন্ ভন্ শব্দ তুলছে,—কে জানে কেন আমার চারিদিকে ? আমার মতোই একটি ডাঁশ অন্যটির থেকে স্বতন্ত্র—প্রতিটিই আবার এক-একটি দমিত্রি ওলিনিন।" ওলিনিন পরিষ্কার বুঝতে পারে কি ওরা ভাবছে, কি বলছে, "এদিকে, ওরে, এদিকে। একটা খাদ্য পেয়েছি—একটা মানুষ।" ভন্ ভন্ করতে করতে ওরা তার গায়ে এসে বসছে। এ কথাও তার নিকটে পরিষ্কার হয়ে যায়—আর সে কোনো রুশ অভিজাত নয়, মস্কোর উচ্চ সমাজের পুরুষ নয়। অমুকের বন্ধু, অমুকের আত্মীয় নয়। তার চতুর্দিককার ডাঁশগুলির মতো শুধু ওরূপই একটি ডাঁশ, বা পাখি বা হরিণের মতো একটা প্রাণী। 'ওদেরই মতো—আমার

ইয়েরোস্কা খুড়োর মতো—আমিও বাঁচব, আমিও মরব।" সত্য কথাই বলছে সে : 'একমাত্র ঘাসই গজায়।"

এখানেই অবশ্য ওলিনিনের আত্ম-গুঞ্জরণ শেষ হয় নি। এর পরেই ওলিনিন সচকিত হচ্ছেন। "ঘাস গজালেই বা কি, আমি তো বেঁচে আছি। আমি সুখী হব, কারণ আমি চাই—সুখ।' অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে, জীব জীবনের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি জাগতেই জেগে উঠছে তার জীবনাবেগ, জীবন-পিপাসা। কিন্তু এই আত্ম-সুখ কামনা মনে জন্মাতে না জন্মাতেই মাথা তুলে উঠল তার আত্ম-বিচার, আত্ম-জিজ্ঞাসা,—'কেন আমি সুখী হতে পারি নি এত দিন ?' আত্ম-পরায়ণ বলে। তারপর, "চারিদিকে সে স্থির চক্ষে তাকিয়ে দেখতে লাগল—গাছের পাতা সূর্য-করে ঝক্ ঝক্ করছে, সূর্য অস্ত পথে, আকাশ নির্মল ;—মনে হল সে সুখী।" "এই তো সুখ! অন্যের জন্য জীবন-ধারণেই সুখ। এ কথা স্পষ্ট।" কোন্ বাসনায় সুখ ? সে পায় তার জিজ্ঞাসার উত্তর : "প্রেমে, আত্মত্যাগে।"

এইরূপে মাথা তুলে দাঁড়াল ওলিনিনের সত্তার দ্বিতীয় শক্তি—আত্ম পরীক্ষা, নীতিবোধ, তিতিক্ষা। তখনি সে সঙ্কল্প গৃহীত হল। অবশ্য সংগ্রাম তখনি শেষ হল না—তবে তাঁর এই সংকল্পেরই জয় ঘোষণা করেছেন 'কসাক' গল্পটিতে টলস্টয়। ওলিনিনের প্রাণাবেগ তা বলে বিদ্রোহ করে নি, তা নয়,—যদিও শেষ পর্যন্ত ওলিনিন সেই কসাক-কন্যা মেরিয়াঙ্কার জন্য তার প্রেমকে করেছে ত্যাগে কল্যাণময়। কিন্তু লেখায় যে সংকল্পের জয় দেখানো যায়—দেখানোই যখন লেখকের কামনা—জীবনে তার জয় তত সহজ নয়। 'সাধারণ মেয়েদের'ও যেমন শরৎবাবু লেখাতেই জিতিয়ে দিতে পারেন, জীবনে পারেন না—এও তেমনি। উপন্যাসেই কি সহজ ? 'শয়তান' নামক টলস্টয়ের শেষ দিককার গল্পটির পাঠকও বুঝতে পারেন—জয় টলস্টয়ের জীবনেও তত সহজ হয় নি। এ গল্পের নায়ক বিবাহের পূর্বে এক যুবতীর উদ্দাম যৌবনাকর্ষণে বন্দী হন। তারপরে বিবাহ করলেন তিনি, দাম্পত্য প্রেমের সুস্থতায় সুখীও হলেন। কিন্তু স্ত্রীর যখন সন্তান-সম্ভাবনা তখন আবার সেই যৌবনোন্মত্তা রমণীর আবির্ভাব হল। বার শত আত্ম-সংগ্রাম সত্ত্বেও নায়কের পত্নীপ্রেম ও সাধু সংকল্প তখন ভেসে যেতে লাগল। জৈব-প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর কবল থেকে কোথায় নীতি-সচেতন হতভাগ্য এই নায়কের মুক্তি ?—হয় তিনি সেই মোহিনীকে হত্যা করবেন, নয় তিনি আত্মহত্যা করবেন।—তাই বলা যায় 'কসাক' যেমন যুবক টলস্টয়ের

দ্বিধাগ্রস্ত সত্তার অভীষ্ট সুসঙ্গতির চিত্র, 'শয়তান' তেমনি অভিজ্ঞ টলস্টয়ের দ্বিধাবিভক্ত সত্তা ও জীবনের রূপক—বলা বাহুল্য স্থূল, বা আক্ষরিক অর্থে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়, সূক্ষ্মঅর্থেই তা প্রামাণিক।

একদিকে টলস্টয়ের প্রাকৃত প্রাণাবেগ অন্যদিকে তাঁর নিষ্করুণ আত্ম-পরীক্ষা ও তিতিক্ষা। প্রবল প্রাণ শক্তির মতোই প্রচণ্ড টলস্টয়ের জৈব-প্রবৃত্তির বেগ, তেমনি দুর্বার তাঁর সত্যাসত্য বোধ আত্মজিজ্ঞাসা, অপরিহার্য নীতিধর্মের ক্ষুরধার বিধি-ব্যবস্থা। এই আত্ম-জিজ্ঞাসা 'নৈতদ্' 'নৈতদ্' বলে অগ্রসর হতে হতে জানাল—সমাজ সত্য নয়, সভ্যতা সত্য নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরস্বাপহরণ। নারী নরকের দ্বার, জৈব কামনা বাসনা মিথ্যার জঞ্জাল, শিল্প-সংস্কৃতিও ছলনার নামান্তর। পৃথিবীতে সত্য একমাত্র প্রাকৃতিক জীবন; তাই সত্য আদিম কৃষক-সমাজ, শ্রম-সার্থক সেই সরল জীবন। সেই কৃষক সমাজই সমস্ত মঙ্গলের আকর আর সভ্যতা সমস্ত অকল্যাণের কারণ। যে কৃষক-সমাজের সঙ্গে তাঁর আজন্ম পরিচয়—যাঁদের ব্যথায় তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা সার্থক—তাঁরাই টলস্টয়ের সত্য।

এ সংগ্রাম যে আমাদের ভারতীয় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংগ্রাম নয়, তা বোঝাবার জন্য জানা দরকার—টলস্টয়ের প্রবৃত্তিও পার্থিবসম্পদের প্রত্যাশী নয়, এবং টলস্টয়ের নিবৃত্তি-বোধও কোনো অপার্থিব পরমার্থের প্রার্থী নয়। তাঁর কাম্য ও তাঁর অভীষ্ট, দুইই পৃথিবীর জীবনকে আশ্রয় করে। তাঁর স্বর্গরাজ্য ও তাঁর সিদ্ধি এখানেই লভ্য। টলস্টয়—কি প্রাণ-স্ফূর্তির উদ্দামতায় কি আত্মত্যাগের উৎকটতায়—পৃথিবীর সন্তান, জীবননিষ্ঠ, বাস্তব-বাদী। তাঁর অধ্যাত্মবাদ অলৌকিক রহস্যবাদ নয়। তাঁর ধর্ম প্রাকৃতিক জীবন।

টলস্টয়ের 'প্রাকৃতিক জীবনে' প্রত্যাবর্তন ও রুশোর 'প্রাকৃতিক জীবনে' প্রত্যাবর্তনে কিন্তু পার্থক্য অনেক। রুশো সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের স্থানে চাইছিলেন ব্যক্তি-স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত ধনাধিকার ও ধনার্জনের স্বাধীনতা যার মূল। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যহীন আদিম কৃষক-জীবনের সম্বন্ধে রুশোর মোহ ছিল কিনা সন্দেহ। টলস্টয়ের পথ ঠিক বিপরীত। ধনিকতন্ত্রের সম্বন্ধে বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে, তাঁর মোহ ছিল না। তাঁর আস্থা ছিল শ্রম-সহিষ্ণু সবল কৃষক জীবনে, তাঁর অভীষ্ট ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে আদিম, কৃষক গোষ্ঠী-চেতনা।

টলস্টয় ও রুশো দুই জনার এই দুই লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নয়; দুই যুগের ও দুই পৃথক পরিবেশেরও ফল। রুশো ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব

কালে যে স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিলেন অভিজাত টলস্টয়ের তা ছিল না। বিশেষত ধনিকতন্ত্রের মধ্যাহ্নে ইওরোপ দেখে (১৮৫৭ ও ১৮৬০-৬১) টলস্টয়ের তা পোষণ করবার কথা ভাবা আরও অসম্ভব ছিল। রুশ সামন্ততন্ত্রের শেষ পর্বে টলস্টয় জন্মেছিলেন জমিদার-শ্রেণীতে। চিনতেন দুইটি শ্রেণীকে—জমিদার-শ্রেণীকে ও কৃষক-শ্রেণীকে। তিনি বুঝেছিলেন কৃষক-শ্রেণীই শ্রম সার্থক। স্বশ্রেণীর সম্বন্ধে মোহ সেদিনের বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের অনেকেরই ছিল না। ভূমিদাস রুশ কৃষকের প্রতি সহমর্মিতায় তাঁরা অনেকেই প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই আদর্শ বলে তাঁরা কেউ কেউ কৃষকের জীবনের শরিক হতেও চেয়েছেন, তুর্গেনিফ-এর 'ভার্জিন সয়েল' তার চিত্র। বিপ্লব-পর্বের নারোদনিক ধারা পর্যন্ত এই সূত্র আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু কৃষক জীবনের সঙ্গে টলস্টয়ের পরিচয় আরও গভীর। সহিষ্ণু, শ্রম-সার্থক, রুশ কৃষকের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রথমাবধি সচেতন। এ মহত্ত্ব কোথা হতে পায়—সামাজিক শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই কারাতায়েভরা?—টলস্টয়ের বিচারে—তাঁদের জীবন প্রাকৃতিক জীবন বলে, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনে-মরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধন কৃষকদের ছিন্ন হয় নি বলে। তাই তাঁরা সরল, শ্রম-সহিষ্ণুতায়, ত্যাগে ধর্মে মহৎ। কাজেই, উন্নতিবাদীদের মতো কৃষকদের উন্নয়নের বা 'উদ্ধারের' সাধনাও টলস্টয়ের নয়। তিনি জানেন 'উদ্ধার' প্রয়োজন বরং সামাজের অন্যশ্রেণীর, শ্রমকুণ্ঠ বিলাস-জীবীদের। তাদেরই প্রয়োজন কৃষক-ধর্মে পুনর্জীবন লাভ।

টলস্টয়ের একচক্ষু যুক্তি সেই পুনর্জীবনের কর্মকাণ্ড প্রণয়নে যখন আত্ম-নিয়োগ করলে, সে সময়েই (ইং ১৮৮০) জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হন। প্রতিক্রিয়ার দাপটে রুশিয়ার উদারতন্ত্রীরা তখন উড়ে গেল। টলস্টয়ের আত্মশুদ্ধির ভাবনা সেই নৈরাশ্যের দিনে কম লোককে আকর্ষণ করে নি—আন্তন চেহফ্‌ যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আর এই টলস্টয়বাদ থেকে পরে মুক্তও হয়েছিলেন—সে কথা তাঁর গল্পেই তিনি বলে গিয়েছেন। বস্তুত, টলস্টয়ের বিচার দিন দিনই আরও নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এই তপস্যা উদ্‌যাপনের উন্মাদনাও বেড়ে চলে। সে উন্মাদনায় পারিবারিক সুখশান্তি সমস্তই লুপ্ত হতে থাকে—সে কাহিনীর [illegible] আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু যা এই উপলক্ষে অনুধাবনযোগ্য তা এই —মূলত দুই বিরোধী শক্তির সংগ্রাম-ক্ষেত্র ছিল টলস্টয়ের জীবন,

কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও রুশ সাহিত্য ও রুশ ইতিহাসকে দুই শক্তিই পুষ্ট করেছে। নিঃসন্দেহ তাঁর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ও 'প্রাকৃতিক জীবন' দুইই কার্যতঃ ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রুশ চার্চের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, রুশিয়ার ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে, দুই শক্তিই একই টলস্টয়ের লেখনীকে করে তুলেছে তরবারির অপেক্ষাও খরধার। তাঁর কণ্ঠরোধ করবার কোনো উপায়ই ছিল না এই সব প্রতিক্রিয়াবাদীর হাতে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'যুগের বিবেক'—যেমন অন্যদিকে দস্তয়েভস্কি হয়ে উঠেছিলেন স্লাবোরহস্যবাদের পুরোহিত। টলস্টয়ের কলম থেকে রুশ বিপ্লবীদের যে রেখাচিত্র বেরিয়েছে তাতেও একটু মমতার স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায়।—বিপ্লববিরোধী হলেও এই ভাবেই টলস্টয় রুশ সমাজে সমাজ-বিপ্লবের মনোভাবকে পরিপুষ্ট করে যান।

কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে 'এহ বাহ্য'। টলস্টয়ের আসল বিপ্লবী দান এই যে, তিনি রুশ সাহিত্যকে সমাজ-সত্যে ও মানব-সত্যে গরিষ্ঠ করেছেন। সেই কথাটিই লেনিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন: "টলস্টয়ের (বিবৃত) সমস্যাবলীর উপর টলস্টয়ের প্রতিভা আলোকপাত করায়, সামন্ততন্ত্রী প্রভুদের শৃঙ্খলপীড়িত একটি দেশের (অর্থাৎ রুশিয়ার) বিপ্লব-প্রস্তুতির পর্বটি সমগ্র মানুষেরই শিল্প-সুষমামণ্ডিত অগ্রগতির একটি পদক্ষেপ রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।"

রুশ উপন্যাস ও টলস্টয়ের অবদান

"রুশ উপন্যাসের পরে উপন্যাস লেখা মনে হয় সময়ের অপচয়", শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর এই কথাটা সাবধান-বাণী। রুশ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সাধারণতঃ মতভেদ নেই। এই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয়ই কোনো একজনার জন্য নয়, গগল থেকে গর্কি পর্যন্ত রুশ ঔপন্যাসিকদেরই জন্য। তারও মধ্যে স্বর্ণ মধ্যাহ্ন যুগ বলা হয় ইং ১৮৬১ থেকে ইং ১৯০৫ পর্যন্ত কালটাকে (প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায়, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই কালটা স্বর্ণপ্রসূ নয় কি? নিঃসম্পর্কিত হলেও স্বভাবতই তুলনা অবশ্যম্ভাবী)। ইং ১৮৪২এ গগলের 'মৃত আত্মা' প্রকাশিত হয়, গনচারফ্‌-এর 'ওবলোমোফ্‌' ১৮৫৯এ তুর্গেনিফ-এর 'পিতা-পুত্র' ইং ১৮৬১তে। তারপর ইং ১৮৬৬তে দস্তয়েভস্কির 'পাপ ও শাস্তি', ১৮৬৭-৬৯এ টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'; ইং ১৮৬৮-৬৯ দস্তয়েভস্কির 'মূঢ়', ইং ১৮৭১-২এ 'কলি-কবলিত' ('দি পজেজড্‌'), ইং ১৮৭৫-৭৭ টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা', ইং ১৮৭৯-৮০, দস্তয়েভস্কির কারামাজোফ্‌ ভ্রাতৃগণ-এর ইং ১৮৯৯এ টলস্টয়ের 'পুনর্জীবন'। এই সব উপন্যাসকেই বলা যায় এ কালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি;—তুর্গেনিফ-এর উপন্যাস ও আরও অনেক সার্থক সৃষ্টি নিশ্চয়ই এখানে বাদ পড়ল। কিন্তু রুশ উপন্যাসের রুশত্ব এবং বিশেষ করে তার বৈশিষ্ট্য যাঁদের সৃষ্টিতে স্বপ্রকাশ, তাঁরা হলেন টলস্টয় ও দস্তয়েভস্কি। এর মধ্যে টলস্টয়কে নিয়ে কোনো কারণেই সংশয়ের অবকাশ নেই; দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে তা আছে। প্রথমতঃ সোভিয়েত রুশিয়ায় দস্তয়েভস্কির প্রতিভা সর্বস্বীকৃত হলেও দস্তয়েভস্কির স্লাবোফিল অসুস্থ জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, তাঁর বিকৃত চিত্র-চিত্রণের 'ভুতসিদ্ধ' প্রকাশ ধারাও প্রায় অনাদৃত। আবার, পাশ্চাত্ত্য জগতের 'একজিস্টেন্‌শিয়ালিস্ট' ভাবনার সাহিত্যিকদের নিকটে দস্তয়েভস্কির মহাগুরু—কতকটা বোধ হয় তা বিংশ শতাব্দীর 'সভ্যতার সংকটের' জন্য, কতকটা সোভিয়ত-বিরোধের সাংস্কৃতিক অজুহাতে। দস্তয়েভস্কির আলোচনা এ উপলক্ষে অবান্তর। টলস্টয়ের সম্বন্ধে কোনো পক্ষেরই সংশয় নেই—উপন্যাসে তিনি মহাগুরু। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের জগতে যে রুশ ঔপন্যাসিকরা ঋতুপরিবর্তন ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যেও টলস্টয় অগ্রগণ্য।

পাশ্চাত্ত্য সমাজ থেকেই আমরা সাধারণতঃ উপন্যাসের উদ্ভব ধরি। মনে করি সমাজে ব্যক্তি-সাতন্ত্র্যের তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে কথাসাহিত্যে জন্মে ব্যক্তি-চরিত্র। সাধারণতঃ ইংরেজ লেখক ডিফো থেকে ফরাসী ফ্লবেয়ার পর্যন্ত ধারাটাই পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের 'প্রামাণ্য' ধারা। এর মধ্যে যে ছোট বড় বিচিত্র স্রোত ও নানা তরঙ্গ আবর্তের অভাব নেই তাও আমরা জানি। ইংরেজী উপন্যাসেও রিচার্ডসন ফিল্‌ডিং স্টার্নে স্মলেট থেকে ডিকেন্স থ্যাকারের মধ্যে স্কট ছিলেন, মিসেস র‍্যাডক্লিফ, লিউস্‌ ও মিসেস্‌ শেলির অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রসসৃষ্টির প্রয়াস সমূহও আছে। তথাপি উপন্যাসের জগৎটা পরিচিত জগৎ, বাস্তব জগৎ। বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনায়, বিশ্লেষণে, জিজ্ঞাসায়, ভাবনায় সমাবেশে মিলিয়ে পরিচিত পৃথিবীর রূপায়ণই উপন্যাস—একথা প্রায় স্বীকার্য। একাজে ফরাসীরা আরও অগ্রসর হয়ে যান। যুগের সম্পূর্ণ ভাষ্যই হবে উপন্যাস। বালজাকের পরিকল্পনা ছিল ১৩৭ খানা উপন্যাসে তিনি একটা গোটা সমাজই রূপায়িত করে ফেলবেন। আর সে সমাজও অন্য কোনো

সমাজ নয়, সামন্ত যুগ ভেঙে অর্থদাস ধনিক উদ্‌গতির সমাজ। বাঁদার কিন্তু উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা মেনেই বুঝলেন তার রহস্য। ব্যক্তি-স্পর্ধার চিত্র ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চিত্র, দুখানি চিত্র তিনি তুলে ধরলেন। বিন্দুতে তিনি নেপোলীয়-যুগে সিন্ধুকে আভাসিত করলেন। এরূপে ছাড়া সেই বিরাট শতমুখী কালকে আভাসিত করা কিরূপে সম্ভব? এক-একটি ক্ষণের মধ্যে কত জটিলতা, কত উদ্বেলতা, কত তরঙ্গ ও ঘাত-প্রতিঘাত। তা বুঝে, বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে জোলা এক-একটি ক্ষণ বা বিষয়কে করায়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন—সহায় তথ্যনিষ্ঠা। পারলেন না যে তা তাঁর ক্ষমতার অভাব নয়, এই পদ্ধতির ত্রুটিতে—ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বা সাংবাদিক সততায় কবলিত করা যায় না। তাতে ডক্যুমেন্ট হয়, রিপোর্টার হয়, অনেক কাজের জিনিস হয় —হয় না মূল্যবান বা মূল-যুক্ত জিনিস। সেদিকে উপন্যাসের অপেক্ষা ফলদায়ক শিল্প-মাধ্যম বরং চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস ফ্লবেয়ার ও জোলায় এসে যেখানে আটকা পড়ে যাচ্ছিল সে হচ্ছে এই তথ্যের ভার। তাকে কবলিত করবার এক অতি-কষিত বস্তুবাদী কলা-কৌশল ফ্লবেয়ারের উদ্ভাবনা। তা সত্ত্বেও 'মাদাম বোভারি' তো যুগের ব্যাপ্তি, যুগের গাম্ভীর্য, কোনোটারই প্রমাণ নয়। জোলার প্রকৃতিনিষ্ঠা ও গভীরতা যা সাফল্য লাভ করেছে, তা তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে নয়, তাঁর মানবিকতায়।

এই তথ্যের ভার থেকে উপন্যাসকে মুক্তি দিল রুশ উপন্যাস। দুভাবে—প্রথমতঃ, রুশ উপন্যাস তার ব্যাপ্তিতে ও গাম্ভীর্যে আধুনিক সাহিত্যকে মহাকাব্যের হারানো মহিমা ফিরিয়ে এনে দিল; রুশ টলস্টয়ের হাতে উপন্যাস হয়ে উঠল মহাকাব্যের দোসর। দ্বিতীয়তঃ, রুশ উপন্যাস শুধু বাস্তবের নিপুণ চিত্র নয়—ফ্লবেয়ার কিংবা হেনরি জেমস্ যে পথে সিদ্ধিলাভ করেছেন সে পথের অনুগামী রুশ দেশেও ছিল। কিন্তু রুশ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য শুধু সেরূপ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ বা চিত্র-সুষমা নয়। তার বৈশিষ্ট্য জীবন-জিজ্ঞাসা। এমনকি, বলা যায় তার বৈশিষ্ট্য ধর্মজিজ্ঞাসা বা সত্যাসত্য-বিনিশ্চয়।

অবশ্য রুশ সাহিত্যেরও পদ্ধতি সেই বস্তুনিষ্ঠা যা উপন্যাসের মূল ভিত্তি। বাস্তববাদ জীবনকেই খোঁজে, কিন্তু তথ্যের ভার যখন জীবনের থেকেও বড় হয়ে ওঠে, কিংবা তথ্যের সীমার মধ্যেই অভিজ্ঞতার অর্থটুকু যখন নিঃশেষ হয়, তখন বাহ্য-সর্বস্ব বাস্তববাদের সঙ্কীর্ণতা বোঝা যায়। বাস্তববাদ শুধু বস্তুনিষ্ঠা নয়, জীবন-নিষ্ঠা। দেহ-মন-আত্মা কোনো একটিই মানুষের সবটা

নয়; শুধু বাহ্য ঘটনার খতিয়ানও জীবন নয়। রুশ উপন্যাসের মাধ্যমে এই সত্যও পরিষ্কার হয়ে উঠল।

আর টলস্টয় উপন্যাসের এই মুক্তির অগ্রদূত।

টলস্টয়ের সাহিত্য-কীর্তি

'যুদ্ধ ও শান্তিকে' এখন এপিক বা মহাকাব্য বললে কেউ বিস্মিত হন না। কারণ এপিক-এ যেসব গুণ আমাদের চোখে পড়ে, উপন্যাসেও তার প্রায় সবই পাওয়া যায়—বিরাট ব্যাপ্তি, গাম্ভীর্য, যুগের নিজস্ব মহিমা, বর্ণনার সারল্য, আর উদার প্রশান্তি। কিন্তু নাই যা তাও লক্ষণীয়—যেমন রথী-মহারথীদের শৌর্যবীর্যের পরিচয়। ইতিহাস সম্বন্ধে টলস্টয়ের যে ধারণা তাতে শৌর্য-বীর্য জিনিসটা—সত্য হোক, মিথ্যা হোক—অবান্তর। প্রাকৃতিক নিয়মে—প্রায় অচেতন রীতিতে—প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন ফোটে ও ঝরে—নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র নবাবাবিতে বা কী লাভ? কুটুজফ্-এর অলসতায় শৈথিল্যেই বা কী ক্ষতি? জনসমাজের মৌন অচেতন শক্তিই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাই, এ মহাকাব্যে রথী-মহারথীরা তুচ্ছ। টলস্টয় অবশ্য 'যুদ্ধ ও শান্তি' রচনায় সচেতন ছিলেন তিনি মহাকাব্য লিখছেন; হোমারের ইলিয়াদ, 'ওডিসি'র সমধর্মীই তাঁর কীর্তি—এরূপ প্রমাণ তার কথায় ডায়ারিতে যথেষ্ট রয়েছে ("Without false modesty it is like the Iliad")। দুইটি পরিবার এই বিপুলভার এপিকের কেন্দ্র নিকোলাস রস্তভ্ ও মেরি বোলকনস্কয়া'র (টলস্টয়ের পিতা ও মাতা) পরিণয়ে; আর (প্রিন্স এন্দ্রুর মৃত্যু হলেও) পিয়ের বেঝুকফ্ (পিয়ের ও এন্দ্রু দুই চরিত্র টলস্টয়েরই প্রতিমূর্তি) ও তৎপত্নী সন্তানবতী নাতাশার সন্তান-পালনের তন্ময়তার। এই পরিধির মধ্য দিয়ে সংসারটির উপর চরিত্র আসে যায়; রুশ জীবনের এক পর্যায় গিয়ে আর এক পর্যায় দেখা দেয়। জীবনের বিরাট মিছিল চলমান, কালের রথের সেই যাত্রা এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে এন্দ্রু, পিয়ের, কারতায়েফ্ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটি নাতিপ্রখর জীবন-জিজ্ঞাসাও সদা জাগ্রত।

'আনা কারেনিনা'য় ঐতিহাসিক পটভূমি নেই, তা গার্হস্থ্য সমস্যার উপন্যাস। দুই জোড়া নব দম্পতীর দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজিডি ও সার্থকতা তার। আলেক্সান কারেনিন ও আনার (ভ্রন্‌স্কির প্রেমাকর্ষণে) বিচ্ছিন্ন জীবন, লেভিন ও কিটির ধীর সার্থকতা—লেভিনের কৃষক-সমস্যার ভাবনা সত্ত্বেও,—এই

টলস্টয়।) এইরূপ বিশ্ব-স্বীকৃত প্রতিভাকে মানদণ্ড করে ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর কীর্তিকেও তাঁদেরই মাত্রায় পরিমাপ করা হচ্ছে সাহিত্যের মাত্রাবোধ স্থির রাখবার উপায়। ক্লাসিক্‌সের উপযোগিতা তাতেই। সেই কথা মনে রেখে বিচার করতে গেলে একটু লজ্জিত বোধ করতে হয়।

বাঙলা উপন্যাসে উদ্দেশ্যহীনতার হাওয়া নিতান্তই নতুন। কিন্তু রোমান্টিকতার একটা ঐতিহ্য প্রথম থেকেই তাতে মিলে, বাস্তববাদী ধারাই বরং সেদিক থেকে বাঙলা উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। রুশ উপন্যাসের পিছনে আছে বেলিনস্কি, চের্নিশেভস্কি, দ্রুব্রুয়ালভ্ প্রমুখ বাস্তববাদী দার্শনিকেরা; হয়তো ফরাসী বাস্তববাদ তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল। কিন্তু বঙ্কিমের মাথায় নি… হার্বার্ট স্পেনসার বাসা বাঁধতে না বাঁধতেই জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার তাড়নায় চেপে বসল শ্রীমদভগবদ্‌গীতা। উদ্দেশ্যহীন তাঁর উপন্যাসও নয়—সে উদ্দেশ্য মহৎ, যদিও ভ্রান্ত। জীবনদর্শন তাতে আছে, ধর্মপিপাসাও আছে। কিন্তু কোথায় সেই বাস্তব-দৃষ্টি, সেই সমাজ-সত্যের সন্ধান, জীবন-সত্যের আস্বাদ। এ সবই হয়তো আছে 'গোরায়'—যা আমাদের এপিক্-ধর্মী প্রধান উপন্যাস, ভারতেতিহাসের বাণীরূপ যাতে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত করেছেন। কিন্তু কোথায় সেই বাস্তব-নিষ্ঠ জীবন-নিষ্ঠ শিল্পদৃষ্টি? কোথায় সেই জীবন-সত্য, সমাজ-সত্য? অথচ, 'গোরার' মহিমা অন্য কোনো বাঙলা উপন্যাসের নে… তা না বললেও চলে।

হয়তো অনেকবার—অনেক-বেশি করে আমাদের পড়া প্রয়োজন টলস্টয়ের সাহিত্য। টলস্টয়ের মৃত্যুর অর্ধশত বৎসর পরেও এই সংকল্পই বাঙলা সাহিত্য গ্রহণ করুক। এই আমাদের সাহিত্যের শিক্ষালয়।

বাংলা ভাষায় টলস্টয়-চর্চা

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দাস আশ্রম' প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'দাসী'-তে সম্ভবত টলস্টয়ের গল্পের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ প্রথমযুগে যা বেরিয়েছে, তার অধিকাংশই সংরক্ষিত হয় নি। স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকলে ধরা যেতে পারে ইংরেজী থেকেই বাংলা তরজমা করা হয়েছে। প্রকাশ তারিখ এবং বিস্তৃত বিবরণ যেখানে দেওয়া হয় নি সেখানে বুঝতে হবে গ্রন্থের প্রকাশকই তা দেন নি।

অনুবাদ ॥

১। ধর্মপুত্র [A Tale of Christening]। ১৯০৭ (?)।

২। টলষ্টয়ের গল্প [Tales from Tolstoi]। টলস্টয়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। অনুবাদক : দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৯।
১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকাসহ একাদশ সংস্করণ ও ১৯৫৫ সালে দ্বাদশ সংস্করণ (৮+২০৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছে।

৩। টলষ্টয়ের গল্প-বিংশতি [20 Tales from Tolstoi]। অনুবাদক : চারুচন্দ্র গুহ। ১৯২০।

৪। রুশের উপকথা (?)। অনুবাদ ও সম্পাদনা : শিশিরকুমার মিত্র। ১৯২০।

৫। বন্দী [The Captive]।
প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই।

৬। বোকা আইভান [Ivan the Fool ?]। ১৯২৩।

৭। লোভের উৎপত্তি। (লোভের মূল—এই বিষয়ের ওপর দুটি ছোট গল্প)। ১৯২৩।

৮। সপ্তর্ষি। (সাতটি গল্পের সংকলন)। ১৯২৩।

৯। বোকার কাণ্ড ('Ivan the Fool' অবলম্বনে)। ১৯২৫।

১০। রুষিয়ার অত্যাচারী শাসক ('Rule by Murder'-এর ভিত্তিতে লিখিত)। ১৯২৫।

১১। রামধনু। (টলস্টয়ের গল্প অবলম্বনে গল্প সংকলন)। ১৯২৪।

১২। আনা কারেনিনা [Anna Karenina]। অনুবাদক : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৪২।

১৩। তমসার শেষ [Visit to the Damned, pt. I]। ১৯৪৪।

১৪। ওয়ার এণ্ড পীস্ [War and Peace, pt. I]। অনুবাদক : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৪৪।
১৯৪৬, ১৯৪৮ এবং পরে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৫। রেসারেকসন [Resurrection]। সংক্ষেপিত। অনুবাদক : খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর। ৪+২৫৬ পৃষ্ঠা। ১৯৪৭।

১৬। রাহু [Kreutzer Sonata]। অনুবাদক : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ৪+১২৮ পৃষ্ঠা। ১৯৩৮।

১৭। শয়তান [The Devil]। অনুবাদক : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৪+১৬৮ পৃষ্ঠা। ১৯৪৯।

১৮। ওয়ার এণ্ড পীস্ [War and Peace, pt. II]। অনুবাদক : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।
প্রকাশকাল দেওয়া নেই। দ্বিতীয় সংস্করণেও প্রকাশকাল দেওয়া হয় নি। ২+২০০ পৃষ্ঠা।

১৯। দি ডেথ অব্ আইভান ইলিচ্ [The Death of Ivan Ilych]। অনুবাদক : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। একটি গ্রন্থপঞ্জী আছে। ১৯৫৪।

২০। জীবন-গোধূলি [The Death of Ivan Ilych]। অনুবাদক : প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ১৫০ পৃষ্ঠা।

২১। হাজি মুরাদ [Hadji Murad]। অনুবাদক : প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ৮+২২৩ পৃষ্ঠা। ১৯৫৪।

২২। নীড় [A Family Happiness]। অনুবাদক : অমিয়কুমার চক্রবর্তী। ৪+১৫৬ পৃষ্ঠা। ১৯৫৪।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৬। পৃষ্ঠা ১৪৪।

২৩। জীবন-স্মৃতি [Recollections]। অনুবাদক : বিমল কর। ২+১১৬ পৃষ্ঠা। ১৯৫৫।

২৪। সেবাস্তোপোলের কাহিনী [Stories from Sevastopol]। অনুবাদক : সরোজকুমার দত্ত। ৪+১৫৮ পৃষ্ঠা। ১৯৫৬।

২৫। পুনরুজ্জীবন [Resurrection]। অনুবাদক : সরোজকুমার দত্ত। ৮+২২৮ পৃষ্ঠা। ১৯৫৭।

২৬। শৈশব, কৈশোর, যৌবন [Childhood, Boyhood and Youth]। অনুবাদক : সাবিত্রী ঘোষ। ৮+৪৩৫ পৃষ্ঠা। ১৯৫৭।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ॥

১। মৃত্যুমোচন [The Living Corpse]। নাটক। অনুবাদক : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি)। ১৩২০ বঙ্গাব্দ (?), ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ (?)। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

টলস্টয় সম্পর্কিত গ্রন্থ ॥

১। ঋষি-টলস্টয়। প্রকাশ তারিখ নেই।

২। টলস্টয়ের জীবনী : মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী। প্রকাশ তারিখ নেই। ১৯২...
খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত বিদ্বান ও রাজনৈতিক কর্মী মোক্ষদাচরণের জীবনাবসান হয়।

৩। বিপ্লবের পঞ্চ-ঋষি (বিপ্লবের পাঁচজন দার্শনিকের অন্যতম একজন রূপে বর্ণিত টলস্টয়ের জীবনচিত্র)। প্রকাশ তারিখ নেই।

৪। টলস্টয়ের স্মৃতি। লিও টলস্টয় সম্পর্কে গর্কীর বিবরণী ("notes")।

৫। চল্লিশ বৎসর (Forty Years : এন. কোস্তমারিয়ভ)। অনুবা...
১৯০৩ (?)।

মহাদেবপ্রসাদ সা...

কবিতাপত্র

প্রেম, নিমজ্জিত

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার হলে আসে। অঙ্গুলি সংকেতে মধ্য সমুদ্রের ক্ষত
ছাথায়ে উদ্বেল শোকে পুনর্বার কেঁপে উঠল। জলের শ্বাপদ
তরঙ্গে উদ্দাম হেসে তীরে এসে ধাক্কা খেল চতুর আহ্লাদে
পাহাড় ভাঙ্গার শব্দে তলদেশে লক্ষ কড়ি সহাস্যে গড়ায়!

ডুবুরীরা দৃশ্য ছাখে···রাত্রির ভৌতিক নীল সিন্ধু খেলা করে
কী রত্ন হারাল অই করতল অকস্মাৎ কম্পিত বেলায়?
দ্রুত নামে গুপ্ত জলে। আলোড়িত তলদেশ উড্ডীন পাখায়
ইতস্তত ভ্রাম্যমান; আস্ফালন করে দুঃখ, অতিকায় তিমি।
কয়েকটি ঝিনুক হাতে উঠে আসে, কারুকার্যে সতত উজ্জ্বল;
অন্তরালে বহু মায়া, সূর্যের মেঘের চ্যুত রৌদ্রকণিকার—
জলের সজল স্পর্শে যেন লুপ্ত সম্রাটের মুদ্রা অগনন।

'এসব, এসব নয়'—। তবু লুব্ধ চেয়ে থাকে; হাওয়ার চিৎকারে
নিজের গলার শব্দ ডুবে যায়, নিরবধি জলের নিঃস্বনে
বুকে তীব্র বাজে বাঁশি; অঞ্জলিতে স্ফীত শুভ্র উজ্জ্বল মুদ্রার
অনির্বাণ গাঢ় জ্যোতি মুখে বিদ্বপাত করে দূরান্ত গ্রহের।

জলে নিমজ্জিত প্রেম, করতলে তবু কি যে উজ্জ্বলতা ভাসে।
জলের নিঃস্বনে আর চন্দ্রাতপে হাওয়ার চিৎকারে।

জন্ম, মৃত্যু

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু···মৃত্যু কোন বৃদ্ধের দুয়ারে
আরেক শীতেও ফিরে গেল···রোম-ওঠা পাগলা কুত্তাটাকে
ম্যাকফারলেন শেষে গাদা বন্দুকেই···বুঝলেন কিনা···
আচ্ছা সে মেয়েটা আর আসে না ওখানে···

প্রশ্নোত্তরে পরিবেশে ছক-কাটা সাধারণ জ্ঞানের
সমস্ত বিশ্বের ছায়া ধরা পড়ছে দৈনিক কাগজে,
পরিতৃপ্ত প্রতিবেশী আলোকিত মুগ্ধ উপাদানে—
মনে হল অপরূপ পানীয়ের গাঢ়-রক্ত শক্তি এক আছে···

চোখ ছোট বড় হয়, কুঞ্চিত কপাল আর কঠিন চোয়ালে
হিংসা ঘৃণা বিন্দু বিন্দু লোনা ঘামে ছাখো জমে থাকে—
গলায় কখনো খেলে মোলায়েম স্বর, যেন ময়ূরের গলা।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাখো সাত রং রোদের আঘাতে···

তাঁকে বলে ভদ্রলোক যিনি নাকি নিখুঁত বাজার
করেন প্রত্যেক দিন, সামাজিক কর্মেও ব্যাপৃত,
হিসেবী ভাষণে তাঁর কাঁপে টেবিলের ঐ সূক্ষ্ম শিল্পকলা···

হে ঈশ্বর একে তুমি জন্ম বলো, নাকি বলো মৃত্যুর মহিমা?

কবিতা

ইমরুল কায়াস

প্রতিটি পুরুষের হিম্মত চাই
অনেককটা অপ্সরীর মালিকানা দখলে,
সবচেয়ে সেই বেশি বিত্তবান
যার নারীর সংখ্যা দুম্বা আর উটকে
ছাড়িয়ে যায় গণনায়;
কয়েকটা খেজুর বা
এক আঁজলা ফোরাতের জলের বিনিময়ে
আমি চাই না জোর করে পাওয়া ভালবাসা।

মরুর সে সব গোলাপেরা
আসমানের মতো চোখ তুলে আমায় ভালবাসে
তারা প্রত্যেকে উৎসর্গ করেছে আমাকে
আঙুরের মতো টসটসে স্তনগুলি, আর
লোভাতুর ঢেউ-এর সৃষ্টি মুখর উল্লাস।

যখন আনন্দ আর হিংস্রতায় তারা
দপদপ করে জ্বলছিল আমার মতো
শিখান্বিত পরাক্রমে
তখন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম
তাদের দেহের আনন্দে আনন্দে
আমার সম্পদ, আমার ক্ষমতার সামান্য কিছু অংশ।

গোলাপের পাঁপড়ির মতো পেলব সেই সব অপ্সরীরা
এখন, হিম্মতওয়ালা মানুষের ঘরে,
মাঝে মাঝে দেখা হয় উৎসবের গোলাপী রাতে।

অনুবাদক / কমলেশ সেন

ইমরুল কায়াস আই-আম-এ জাহেলিয়াত বা প্রাক্-ইসলামিক যুগের আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী সাহিত্যে আজও তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা।

বাতিদানের আলোয়

শেখ আবদুল জব্বার

ঠিক তার বিদায়ী মুখের মতো ম্লান উদ্ভাসে ভরে গেছে সারা ঘর।
কেন রূপসী দাহিকা ছুঁয়ে দিয়ে গেল এমন বাঁচার ব্যাপ্তি!

এবার একলা ঘরে বিশ্বের মানচিত্র গেল খুলে,
মানচিত্রের জটিলতায়, কই সে উত্তরণের উজ্জ্বলতম দ্বীপ?
শুধু গোলকের চারপাশে, অদূরে একের পর এক
ভবিতব্যের মতো ঠেলাঠেলি করে দক্ষ শিকারী-রাত্রি।

স্তম্ভিত বাতিদান আব্ছা অন্ধকারে
জ্বলছে দাহ্য, নরম মোমের মতো শরীর

এখন আর তার সীমা ছড়িয়ে যায় না অসীমে
দেয়ালের মুঠোয় কুঁচকে গেছে আলোর বৃত্ত
কাঁপছে ভয়ার্ত, তীক্ষ্ণ থাবার মধ্যে শিকার।
এবার আঁধারেই হারাবে কি রূপদর্শী যুবকের সব!

ও কি বৃষ্টিতে ভিজোবেই তার চোখের কোমল ঘাস
খরতাপে
কোন বর্ষণহীন মুখ উঠবে না জলে
শুকিয়ে দিতে অশ্রু।

তবে অবিরাম হোক আপাত বৃষ্টির শরনিক্ষেপ
শিকারী রাত্রি
তুমি হও আমার শিকার
দেয়ালের ধাতব বিন্যাসে আমি
বন্দী

আকাশের ফাটা গলায় ছড়িয়ে যাক এই আর্তকণ্ঠ,
মত্ত বাতাস জোরে কড়া নাড় দরজার, তোল অবিরাম ধ্বনি
প্রাচীর কাঁপিয়ে ডাক দাও মহাপ্রাণতায়:
কে ভীরু আছ ঘরের মধ্যে, সবার মধ্যে একা!

আর শোক নেই দ্বিগুণ উৎসাহে গলে যেতে,
ওর জলে যাওয়াতেই সব।
পড়ুক ছড়িয়ে ঘন-নিক্ষেপে মোমের নরম অশ্রু
টুপ্‌টাপ টুপ্‌টাপ
এই আয়ুষ্কালের আসন্ন ঘটনাগুলির মতো ওই খুলে গেল
সব জানালা
শিখার বর্শা বিঁধছে অন্ধকার
এখানেই শুরু হয় সব, এখানেই শেষ।

ঝোড়ো কম্পনে দেয়ালে দুলছে অন্ধকারের গাছপালা
নাড়ীতে তাদের মহাকালের টান, ছিঁড়ে দিচ্ছে পারম্পর্য
বহির্দেশ
ঝড়ের মধ্যে আলোকে তুলে ধরা
সে আর এক দুঃসাহসিক ব্যাপার।

এবার পুড়ে যাক সব শিকারী রাত্রির কালো পোষাক
বাতিদানের শেষ আলোয়।
মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক সমুদ্রপথ ও মহাদেশের রঙ।
ভিড়ের মধ্যে খুঁজে নিই আমি তাকে, লোহিত আলোর গহনে
যেখানে সে সন্তপ্ত
তার অন্তিম কণ্ঠে বলিয়ে নিতে—আলোর দুঃসাহসই তো
জীবন
মুহূর্তের উত্তাপে গলে যেতে

অনন্তকালে একবার।

অন্ধকারে

স্বরজিৎকুমার দাশগুপ্ত

দেখো আমি অন্তরালে কেমন অতল হতে পারি।
রক্ষক আঁধারপুঞ্জ লক্ষ লোমকূপে, মুখ, বক্ষ, বাহু, পদসন্ধিমূলে
ছড়ায়ে রয়েছে···দেহ শান্ত হয়ে শুয়ে আছে নরনারীদের সঙ্গ ভুলে।
রমণীঘটিত কিংবা স্বয়ংকৃত ক্লান্তি···প্রিয় স্মৃতি···
ভবিষ্যের চিন্তা···শিল্পে যথোচিত বক্তব্য প্রভৃতি···
লোভ হিংসা আস্ফালন দেওয়ালে ঝুলন্ত সারিসারি।

দেখো অই অস্ত্রগুলি সব খুলে আপাতত অঢেল স্তব্ধতা
কেমন আশ্চর্য ভাবে মেলে আছে প্রসারিত দেহ।
সমস্ত দুঃখের উৎসে প্রধান সত্যকে আর কেহ
জেনেছ কি গূঢ় রক্তে···দিগন্তবিস্তৃত গোলগোথা
এই শরীরের বিশ্বে···চতুর্দিকে অখণ্ড নির্জনে
বৃদ্ধি পেতে পেতে দেহ গ্রাস করে সমস্ত সৃষ্টিকে।
দেখো দেহ প্রচারিত স্ফুরিত বিস্তৃত চতুর্দিকে···
অন্ধকারে শুয়ে আমি চেয়ে আছি তৃতীয় নয়নে।

চীনের প্রাচীন গীতিকবিতা

পো চু আই

১

শুনেছি গ্রামের টিলায় থাকবে বলে
তুমি বাঁশবনের
নির্জন পথটা ধরে চলে গেছ,
আমি এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলেম
তোমার দক্ষিণের বাগানটা আমাকে দিও
আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় দেখব।

২

হ্রদের নিচের ছায়ায়
সাদা মুখ না তো, দেখি কেবল সাদা চুল ;
যৌবন আমার ফুরিয়ে গেছে—
সে আর আসবে না,
হ্রদের জলে বৃথা খুঁজে খুঁজে
কি আর লাভ হবে বল।

৩

ফুলের মতো মনে হয় ফুল না,
কুয়াশা নয়, কিন্তু দেখায় ঠিক কুয়াশা ;
বসন্তের স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী যার আবির্ভাব
আর সকালের মেঘের মতো ক্ষিপ্র যার প্রস্থান।

তাকে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না।

৪

টেবিলের ওপর রেখে দিলাম আমার বাদ্যযন্ত্র।
এখন আমি মুগ্ধতায় বুক ভরিয়ে
অলস হয়ে বসে থাকব।
আমার বাজাবার কি দরকার বল,
বাতাসই তাতে সুর তুলে দেবে দেখো।

জন্ম : ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ।
মৃত্যু : ৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

অনুবাদক / অশোক মুখোপাধ্যায়

নীলকর : রামমোহন ও দ্বারকানাথ

প্রমোদ সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নীল একটি পণ্যদ্রব্য হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রাচীনকালে ,একমাত্র ভারতবর্ষেই নীলচাষ হত এবং ভারত থেকেই নীল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। আমেরিকা ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হবার পর সেখানকার বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে নীলচাষ হতে থাকে এবং ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ও স্পেনীয় বণিকদের মধ্যে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো নীলের ব্যবসাতেও ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।

বাংলা ও বিহার ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসার পর থেকে ইংরেজ বণিকরাই বাংলাদেশে নীলচাষ প্রবর্তন করে এবং নীলচাষেই ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হয়। বাংলায় নীলচাষ প্রসারিত করার জন্য কোম্পানি সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করে। বহু অর্থব্যয় করে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ থেকে প্ল্যাণ্টারদের নিয়ে এসে তাদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এখানে বসবাস করাতে থাকে। বাংলায় নীল আশানুরূপ বিস্তার লাভ করছে না দেখে ১৭৮৬ সালে কোম্পানির বিলাতের ডাইরেক্টররা গভর্নর জেনারেলকে অনুযোগ করে লিখে পাঠালেন যে, "যখন আমরা বাংলার শস্তা মজুরি ও অনুকূল জলবায়ুর কথা ভাবি, তখন আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না যে রপ্তানি করার জন্য ওখানকার নীল একটা মহামূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ করে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।" ১৭৮৮ সালে তাঁরা আবার লিখলেন যে নীলের অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও একটা রাজনৈতিক দিক আছে যার গুরুত্ব খুবই বেশী। নীলের জন্য প্রচুর টাকা প্রতি বৎসর বিদেশীদের দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের জমিতে 'নেটিভ'দের পরিশ্রমে যদি নীলের মতো মূল্যবান ও ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটা রপ্তানিদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহলে কোম্পানির রাজস্বের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। ঐ চিঠিতে ডাইরেক্টররা আরও লেখেন

যে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করে, কিন্তু টাকার পরিবর্তে তারা যদি নীল পাঠায় তাহলে টাকা পাঠানোরই সমান হবে।[১]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। নীল-ব্যবসায়ের সঙ্গে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। বাংলায় নীলচাষ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইংরেজ বণিকরা বেশীর ভাগ নীল অযোধ্যা, আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে কিনত, এসব প্রদেশ তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু যে-সব পন্থার দ্বারা তারা এসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল, নীল-ব্যবসা যে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা তখনকার কোম্পানির চিঠিপত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। উত্তর-ভারত জয় করতে নীল ব্যবসা ইংরেজকে অনেক সাহায্য করেছিল এবং অযোধ্যাতে নীলের লাভ্যাংশের টাকায় ইংরেজ এমন দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছিল যা কালক্রমে পাঞ্জাব বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।[২]

যাই হোক, অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি সরকারের অর্থে ও আরও অনেকপ্রকার সাহায্যে বাংলায় ও বিহারে নীলচাষ ও নীলকুঠি তো সুপ্রতিষ্ঠিত হলই, বিশ্বের বাজারেও বাংলার নীল শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে লাগল ও অন্যসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে এই ব্যবসায়ে বাংলার নীল একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল। ১৮০৭-৮ সালে বাংলা থেকে যে নীল বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল তার মূল্য ছিল এক কোটি টাকারও বেশী। পরবর্তীকালে নীলের রপ্তানির পরিমাণ ও তার মূল্য আরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ইংরেজ নীলকররা সরকারের কাছে থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও কোম্পানির সনদ অনুযায়ী এদেশে জমির মালিক হয়ে বসবাস করার অধিকার তাদের ছিল না। নীলচাষের জমি, এমনকি নীল-কুঠিটি পর্যন্ত বেনামীতে থাকত। তাই ১৮৩৩ সালে নতুন সনদ প্রস্তুত হবার অনেক পূর্ব থেকেই এদেশে যাতে তারা জমির মালিক হয়ে বসবাস করার অধিকার পায় তার জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করে দিল। প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা, আবেদন-নিবেদন, সভাসমিতি এর জন্য কলকাতায় হয়েছিল। এই আন্দোলনকে ইংরেজীতে 'কলোনাইজেশন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল

এবং তদানিন্তন নেতৃস্থানীয় বাঙালীদেরও, সপক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, এ আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছিল। সাধারণ বাঙালীরা ও জমিদারদের এক অংশ কলোনাইজেশনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিলেন।

তখনকার বিশিষ্ট সংবাদপত্র "সংবাদ-কৌমুদী" লিখল যে, ইতিমধ্যেই নীলকররা ধানের জমি দখল করে সেখানে নীলচাষ করছে এবং তার ফলে দেশে চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে লোকের দুঃখকষ্টও বেড়ে যাচ্ছে। নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীগুলিও সংবাদপত্রে ক্রমশ প্রকাশ হতে লাগল। দ্বারকানাথ তার উত্তরে ১৮২৮এর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর 'সংবাদ-কৌমুদীতে' জনৈক জমিদার নাম দিয়ে এক চিঠি লিখলেন যাতে দ্বারকানাথের কলোনাইজেশন সম্পর্কে সব যুক্তিগুলিই মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, পূর্বে যেখানে চাষীদের জমিদারের জন্য বেগার খাটতে হত, এখন সেখানে নীলকরদের কাছ থেকে তারা ভাল টাকা পায়—মাসে ৪ টাকা করে—যার ফলে তারা সুখে আছে ও স্বাধীনভাবে দিন কাটাচ্ছে; অনেক জমি যা পূর্বে অনাবাদী ছিল তা এখন নীলকরদের দৌলতে আবাদ হচ্ছে; মধ্যবিত্তেরা —যাদের আগে দুঃখকষ্টের অভাব ছিল না—তারা আজ নীলকরদের কাছে ভাল মাইনেতে কাজ করছে তাদের এখন আর জমিদার ও মহাজনদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হয় না (এই 'মধ্যবিত্তদের' উন্নতি দেখে দ্বারকানাথ খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন); কলোনাইজেশন হলে ও অবাধ বাণিজ্য চললে দেশে আরও শিল্পবাণিজ্য বিস্তার লাভ করবে, নীলচাষ বেড়ে যাবে ও তাতে চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা আরও উন্নত হবে।

বাস্তবিক পক্ষে দ্বারকানাথের এই সময়কার চিঠি, প্রবন্ধ, বক্তৃতাগুলি পড়লে মনে হয় যে, ইংরেজদের এই দেশে বসবাসের সপক্ষে তিনি যেন একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। একজন ভারতীয় জমিদার 'জনবুল' পত্রিকায় এদেশে ইংরেজদের বসবাসের বিরোধিতা করে ও তার কুফল দেখিয়ে যে চিঠি লেখেন, দ্বারকানাথ তার কড়া জবাব দেন ১৮২৯ সালের ১৭ই মার্চের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায়। তাতে তিনি লেখেন যে বিদেশীদের তিনি এদেশে ডেকে আনেন নি; বরং তারাই এদেশে প্রথমে এসেছে, ক্রমশ

প্রদেশ জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে ও তাদের দেশবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সৎ কাজে নিয়োজিত হতে তারা বলেছে। দ্বারকানাথ জিজ্ঞাসা করেন—এইসব বিদেশীরা সত্যই কি আমাদের এত ক্ষতি করেছে যে তাদের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে, না, তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে, ভারতীয়দের উপকার করেছে ও তাদের অবস্থার উন্নতির হেতু হয়েছে? তারপর তিনি কলকাতার দিকে দেখিয়ে বলেন, "এখানে আমরা দেখতে পাই যে বিদেশীরাই বিশেষ করে স্কুল স্থাপন করেছে, দেশের বালকদের বাংলায় ও ইংরেজীতে শিক্ষা দিচ্ছে। তাঁরা এর জন্য শুধু টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তাঁদের অনেকে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সময় দিয়ে বিনাবেতনে তাঁরা পরিশ্রমও করেন। এখানে আমরা ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের শত শত ছেলেদের দেখতে পাই—তারা সুশিক্ষিত ও অনেক পরিমাণে কুসংস্কার থেকে মুক্ত।...কলকাতায় আমরা আরও দেখতে পাই যে, এইসব বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার মধ্যশ্রেণীর লোক স্বাধীনচেতা হয়েছে।...এই সব বিদেশীরা তাদের রক্ষাধীনে যারা আছে অথবা রায়তদের পদদলিত করার কথা চিন্তা করতেও ঘৃণা বোধ করে।"

পরিশেষে ঐ চিঠিতে দ্বারকানাথ চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, "যে কোনো ব্যক্তি—যাঁর সাধারণ বুদ্ধি ও সত্তা আছে—তিনি কলকাতার অধিবাসীদের সঙ্গে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে দেখুন ও তাদের পরস্পরের মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার তুলনা করে দেখুন এবং তারপর প্রকাশ্যে বলুন, আমার এই কথাটা বলা যুক্তিসঙ্গত কিনা যে, এদেশে ইউরোপীয়দের অবাধ বসবাসের যিনিই বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত হন না কেন—অবশ্য এই শর্তে যে বিচার-ব্যাবস্থায় এই একই সময়ে কতকগুলি পরিবর্তন আনতে হবে—তিনি হচ্ছেন ভারতীয়দের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শত্রু।"

এই সময়ে ইংরেজ বণিকরা কলোনাইজেশন ও ফ্রি-ট্রেডের (অবাধ বাণিজ্যের) দাবি করে কলকাতার টাউন হলে কয়েকটি সভা করে। তার মধ্যে ১৮২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বরের সভাটি বিখ্যাত। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও আরও কয়েকজন ভারতীয় এই সভায় উপস্থিত হয়ে ইংরেজ বণিকদের দাবি সমর্থন করেছিলেন, এবং রামমোহন ও দ্বারকানাথ বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

তাঁদের বক্তৃতার সারমর্ম হল এই যে, ভারতে আসবার পর থেকে ইংরেজ এদেশে যে সব শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তন করেছে তার ফলে দেশের লোকের উপকারই হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন যে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের এ বিশ্বাস হয়েছে যে বাণিজ্যের বাধানিষেধগুলি উঠে গেলে এবং ইংরেজদের এদেশে মূলধন খাটাবার ও স্থায়ী বাসিন্দা হবার সুযোগ দিলে ভারতের উন্নতি হবে, দেশবাসীদের শ্রীবৃদ্ধি হবে—ভারতীয়রা সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে অগ্রসর হবে। নীলচাষ সম্বন্ধ তাঁরা বলেন যে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানেন যে নীলচাষহীন অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় নীলচাষ অঞ্চলের চাষীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলচাষীরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মোটের উপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নীলচাষের দ্বারা কৃষকরা ও জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে।[৩]

রামমোহন বিলাত যাবার পর কমন্স-সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস করার প্রশ্নের উপর একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে ভারতে কলোনাইজেশন হলে নয় রকমের উপকার, আর পাঁচ রকমের অপকার হতে পারে। এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের ভাল ফল খারাপ ফল—উভয় দিক আলোচনা করে সর্বশেষে রামমোহন তাদের বসবাসের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। তবে তিনি একথাও বলেছিলেন যে প্রথম দিকে এই বসবাস পরীক্ষামূলক হওয়া উচিত এবং কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত, চরিত্রবান, ভদ্র ও সঙ্গতিপন্ন ইউরোপীয়দের দিয়ে এই কাজ শুরু হওয়া উচিত, আর দ্বিতীয়ত, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য, অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের জন্য একই আইন করা হলে ও তাদের থেকে সমানভাবে জুরী গৃহীত হলে উভয়কার মধ্যে বৈষম্য অনেকটা দূর হবে।[৪]

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এইপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বুঝতে হলে তখনকার বাংলার বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলার ইতিহাসে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখময় যুগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালীর স্বাধীনতার অবসান ঘটে এবং বিদেশী শাসনের ও বণিকতন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ইংরেজ শাসনের ও তাদের অবাধ শোষণের প্রথম অভিসম্পাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইং ১৭৬৯-৭০)—যখন বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি বাঙালীকে অনাহারে

প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। তার কয়েক বৎসর পর বাংলায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়।

ইতিমধ্যে, বাংলায় ইংরেজ বণিকতন্ত্র স্থাপিত হবার থেকেই শুরু হল বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার পাঁচ-শালা, দশ-শালা ইত্যাদি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার পালা, যার ফলে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ভঙ্গুর সমাজে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। ঠিক যে সময়ে ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফরাসী দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন করে সমগ্র ইউরোপে প্রগতির পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' কায়েম করে বাংলায় ধসে-পড়া সামন্ততন্ত্রকে এক নতুন ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক রূপ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন ও সেই ভবিষ্যৎ বাংলার প্রগতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করে দিলেন।

এই যুগে বাংলার ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-শাসন ও বাণিজ্যের সহায়করূপে এক নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল, যাকে বলা যেতে পারে কম্প্রোডোর (মুৎসুদ্দী) শ্রেণী। কলকাতার দেব-পরিবার, ঠাকুর-পরিবার, রায়-পরিবার, সিংহ-পরিবার, মল্লিক-পরিবার, প্রভৃতি সকলেই সেই যুগের ইংরেজ আমলের সৃষ্টি। নানাভাবে ইংরেজের সহযোগিতা করে এঁরা সকলেই প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদার হয়ে বসেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই শ্রেণীর সঙ্গে ইউরোপের বুর্জোয়া-শ্রেণীর দু-একটা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, তাদের শ্রেণী-চরিত্রের মধ্যে মৌলিক তফাত ছিল।

এ প্রবন্ধে যে যুগের আলোচনা হচ্ছে সে-যুগ ছিল ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের যুগ, যার ফলে শিল্পপতিদের প্রভাব বেড়ে উঠছিল। এ-যুগ ছিল বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের, বাণিজ্য-ধনিকদের বিরুদ্ধে শিল্প-ধনিকদের সংঘর্ষের যুগ। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁদের এই প্রচেষ্টা রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল ইংলণ্ডের সংস্কার আন্দোলনের (Reform Bill) মধ্যে। এই আন্দোলন রামমোহনের চিন্তাধারাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[৫] এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছিল। ইংরেজ শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাদের কতকগুলি দাবি (অবাধ-বাণিজ্য, কলোনাইজেশন ইত্যাদি) আদায় করবার জন্য এবং

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ধ্বংস করার জন্ত ভারতীয়দের সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বে-সরকারী ইংরেজদের তাই বাঙালীদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। কলোনাইজেশন আন্দোলনে, কোম্পানির সনদের পুনর্বিবেচনার জন্ত আহূত সভায়, রামমোহনের স্মৃতি-সভায়, মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সভায়, বিদেশে ভারতীয় কুলি-প্রেরণের প্রতিবাদ সভায়, শিক্ষাবিস্তারের জন্ত স্কুল-কলেজ কমিটিতে, ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরী অফিস, ও আরও অনেক ব্যাপারে ইংরেজ ও বাঙালী সহযোগিতা করতেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানেও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ডেভিড হেয়ারের মতো কয়েকজন মহাপ্রাণ ইংরেজ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রণয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৮৩৩ সালের নতুন সনদে ইংরেজ শিল্পপতি-প্রতিনিধিদের দাবিগুলি মোটামুটিভাবে আদায় হয়ে যাবার পর থেকেই তাদের সুর রাতারাতি বদলে যায়। এই সব ইংরেজদের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরবর্তী দশকে তথাকথিত "কালা কানুন" আন্দোলনের সময় উগ্রভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রামমোহন ও দ্বারকানাথের নীলকর, কলোনাইজেশন, ফ্রি-ট্রেড সমর্থন সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় (কার্তিক : ১৩৬৫ ; বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক : ১৩৬৬) "ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন" নাম দিয়ে কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, এবং ইতিহাসের কি নির্দেশ ছিল তাও আবিষ্কার করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যেনবাবু তাঁর এই প্রবন্ধে রামমোহন, দ্বারকানাথের কলোনাইজেশন ও অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে মতামত সমর্থনে এমন সব তথ্যের ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন যা মোটেই বাস্তবানুগ নয়, বরং সম্পূর্ণ বিকৃত।

সৌম্যেনবাবুর মোদ্দা কথা হল, রামমোহন দ্বারকানাথ কলোনাইজেশন ও অবাধ বাণিজ্য সমর্থন করে 'দূরদর্শিতার' পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতে "'কলোনাইজেশন' এই শব্দটিকে ঘিরে সেদিন যে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলছিলো তার মোদ্দা কথাটি ছিল—শিল্প-বিপ্লব চাই কি শিল্প-বিপ্লব চাই না। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে,

বাংলার জমিদারেরা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিলেন তার বিপক্ষে। ...ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ানোর শক্তি তখন এদেশের লোকের বিন্দুমাত্র ছিল না (?)··· ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কি করে ইংরেজদের উপস্থিতিকে ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে সেইটেই ছিল রামমোহনের ও দ্বারকানাথের ভাবনার বিষয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-বিষয়ক—সবদিক থেকে পরিবর্তন আনতে হবে ভারতবর্ষে। ···বদ্ধজলে অনড় নৌকোর মতো দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। তাকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে গেলে সে শক্তি দরকার সেই শক্তি ইংরেজ জাতির কাছ থেকে আহরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। (?) তাদেরই সেদিন মাল্লা করে ভারত-তরীকে বদ্ধ জল থেকে স্রোতের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এইটি ছিলো ইতিহাসের নির্দেশ সে যুগে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ সেটা পরিষ্কার ভাবে বুঝেছিলেন। তাই ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যে দুটি অসামান্য পুরুষ এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।" (চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬)

রামমোহন, দ্বারকানাথ অনেক বিষয়েই যে বিপ্লবী ও দূরদর্শী ছিলেন তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তাঁদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা, মিশনারীদের দ্বারা ভারতীয়দের বিজাতীয়-করণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লবকে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য এবং সতীদাহ নিবারণের জন্য সংগ্রাম, ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আন্দোলন, ভারতে শিল্পবিস্তারের প্রচেষ্টা, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের বৈপ্লবিক ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু পক্ষান্তরে নীলচাষ, কলোনাইজেশন, অবাধ-বাণিজ্য, ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় ভারতে শিল্প-বিপ্লব ঘটানো ইত্যাদি ব্যাপারে যে তাঁরা দূরদর্শিতা ও বৈপ্লবিকতার মোটেই পরিচয় দেন নি ভারতের পরবর্তী কালের ঔপনিবেশিক ইতিহাস তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে। দ্বারকানাথের নিজের জীবনও এবিষয়ে কম বড় প্রমাণ নয়।

১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ কর্তৃক কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ভারতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এর পূর্বে বাঙালীরা ইংরেজ বণিকদের সুদে টাকা ধার দিয়ে ও তাদের মাল সরবরাহ করে, অর্থাৎ মুৎসুদ্দিগিরি করে ধন

উপার্জন করত। বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথই প্রথম, যিনি খুব বড় আকারে বহু ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বহু নীলকুঠি, রেশমকুঠি, চিনির কারখানা, জাহাজ কোম্পানি, কয়লার খনিরও তিনি মালিক ছিলেন। আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য তিনিই ভারতে প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। দ্বারকানাথ বিলাত ভ্রমণকালে শেফিল্ড, নিউক্যাসেল, মাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, গ্লাসগোর শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে পরিদর্শণ করেছিলেন। ভারতে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তনের জন্যও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে (১৮৪২, জানুয়ারী) ইউরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলি, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়।"[৩]

মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ সালে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় এবং তার এক বৎসর পরই বিখ্যাত কার-ঠাকুর কোম্পানির মাত্র ১৩ বৎসর অস্তিত্বের পর পতন ঘটল। সেই সময় দেখা গেল যে কার-ঠাকুর কোম্পানির "মোট দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা, ৩০ লক্ষ টাকার অসংস্থান।" পাওনাদারদের দাবি মেটাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সব সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন: "আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলই হাত হইতে চলিয়া গেল।···'বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক' বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি বলি যে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।' তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন।"[৪]

দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি ঐতহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ—কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসই নয়। কার-ঠাকুর কোম্পানির পতন কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক দুর্ঘটনাই নয়, একটি জাতীয় দুর্ভাগ্যও বটে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শাসনাধীনে ঔপনিবেশিক ভারতের এইটাই স্বাভাবিক পরিণতি। দ্বারকানাথকে সেই যুগের ইউরোপের শিল্প-সংগঠকদের

সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যাঁরা শিল্প-বাণিজ্যের সাম্রাজ্য গড়ে তাঁদের দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন। দ্বারকানাথও তাই যে করতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশে এরূপ শিল্প-সংগঠকদের স্থান কোথায়? স্বাধীন ইউরোপে ও আমেরিকায় রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে সেখানকার বুর্জোয়ারা সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, তাতেই তারা শিল্পবিস্তারে সফল হয়েছিল। "ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য" রামমোহন, দ্বারকানাথ যে চেষ্টা করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবারই কথা। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বাঙালীর অন্যান্য যেসব শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার পরবর্তীকালে বহুদিন যাবৎ আর কোনো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি।

ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারতীয় নেতাদের সমর্থনে যা চেয়েছিল—অবাধ-বাণিজ্য, কলোনাইজেশন—তারা তা পেয়েছিল এবং তাদের স্বার্থে তার সদ্ব্যবহারও করেছিল। কিন্তু রামমোহন, দ্বারকানাথ বাঙালী ও বাংলার জন্য যা চেয়েছিলেন তার কিছুই ঘটল না। তাঁরা ভেবেছিলেন অবাধ-বাণিজ্যের ফলে ও ইংরেজদের এদেশে বসবাসের ফলে বাংলার শিল্পোন্নতি হবে, দেশের মূলধন বাড়বে, বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হবে। তাঁদের এই সব সুন্দর সুন্দর কল্পনাগুলি স্বপ্ন-জগতেই রয়ে গেল। শুধু তাই নয়, নিজেদের অজ্ঞাতসারে যে বিষবৃক্ষ রোপন করতে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন তার বিষময় ফল বাঙালীর জীবনে, বিশেষ করে নীল-চাষীদের মধ্যে, পরবর্তী ৩০ বছরে সে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল তার কথা আজও কোনো বাঙালী ভুলতে পারে নি।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজের দেশে যে প্রগতিশীল ভূমিকা, আর ঔপনিবেশিক দেশে তার যে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা—এই দুইটিকে তখনকার বাঙালী নেতারা এক করে ফেলেছিলেন। যে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ইংলণ্ডে এত প্রগতিশীল তারাই যে তাদের শ্রেণীস্বার্থে ভারতে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, এই সত্যটি উপলব্ধি করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১০০।১৫০ বছর ধরে ইতিহাস যে ভুল সর্বক্ষেত্রে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে, সেই ভুলটাকে আজ এত আড়ম্বরের সঙ্গেও এত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে সৌম্যেনবাবু "দূরদর্শিতা" ও "বৈপ্লবিক" বলে যেভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন,

তা যেমনই অনৈতিহাসিক তেমনই হাস্যকর। রামমোহন ও দ্বারিকানাথকে সর্ববিষয়ে 'অভ্রান্ত' প্রমাণ করার চেষ্টাটা ভ্রান্ত চেষ্টা। দেড়শো বছর ধরে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী কী নির্মমভাবে ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক ভূমিকা পালন করেছিল এবং ভারতবর্ষকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে একটা ঔপনিবেশিক কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করে রেখেছিল, তা স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও জানে, এ সত্যটা সৌম্যেনবাবুর পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব।*

---

* সৌম্যেনবাবু "ভারতে শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন" প্রবন্ধে আরও যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তা বর্তমান লেখকের সদ্য প্রকাশিত "নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ"-এ আলোচিত হয়েছে।

নির্দেশিকা

১। "Reports and Documents connected with the Proceedings of the East India Company in Regard to the Culture and Manufacture of Cotton, Raw Silk and Indigo in India," London, 1836, pp 9-10.

২। Ibid, p. 56.

৩। "Royal Asiatic Journal," Vol II, May-August, 1880.

৪। Works of Raja Ram Mohon Roy, Panini Office ed, pp 316-17.

৫। Mary Carpenter : "Ram Mohan Roy", pp 77-78.

৬। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : "আত্মজীবনী", পৃঃ ১২৭

৭। ঐ, পৃঃ ১৪৯-৫০

প্রাচ্যবিদ্যার প্রাঙ্মুখী আয়োজন

গোপাল হালদার

।দুই।

ভারত-বিদ্যায় অবশ্য ভারতবাসী আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে, কিন্তু কোনো বিদ্যাই কারও একচেটিয়া নয়। ভারতবিদ্যায়ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা কেউ কেউ দিক্‌পাল। তবে তাঁরা অনেকে আসেন নি, স্থানমাহাত্ম্য তার কারণ কিনা জানি না। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ পণ্ডিতদেরই আমরা বেশি চিনি, পশ্চিম-জার্মানির ভারতবিদ্ বিশেষ এসেছিলেন বলে মনে হয় নি। আসলে হিটলারের মাহাত্ম্যে জার্মান প্রাচ্যবিদ্‌দের গৌরব প্রায় রাহুগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। মুক্ত হতে সময় লাগবে। পশ্চিম-জার্মানি কারু-বিদ্যায় এবং সম্ভবত সামরিক বিজ্ঞানেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—প্রাচ্য-বিদ্যার জন্য তার মাথাব্যথা নেই। পূর্ব-জার্মানির প্রাচ্যবিদ্‌রা স্বভাবতই এসেছিলেন স্বচ্ছন্দ চিত্তে; তাঁরা আবার প্রাচ্য-চর্চায় নেমেছেন। ভারত-বিদ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করার দিন এখন আর নেই। ফরাসী প্রাচ্যবিদ্‌রা এসেছিলেন স্বল্প-সংখ্যায়—অন্তত ভারতবিদ্যার শাখায়। মার্কিন প্রাচ্যবিদ্‌রা সব শাখাতেই হয়তো পূর্বের অপেক্ষা বেশি তৎপর। এবার তাঁদের তৎপরতার বিশেষ কারণ—তাঁরা আগামী বিশ্বসম্মেলনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আহ্বান করে নিতে চাইছিলেন। পূর্ব ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্‌রাও সংখ্যায় কম নন। এর মধ্যে দুশন্ জ্‌বাবিতেল বাঙলায় ও হিন্দীতে ক্রাস্ চেকোস্লোভাকিয়ার যোগ্য গবেষক—দুজনারই প্রশংসা করবার মতো নিবন্ধ ও কাজকর্ম। বিদেশীয়দের মধ্যে সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্‌রা যে সংখ্যায় সর্বাধিক হবেন, এ তো বোঝাই যায়—ককেশিয়া মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ্যার অঞ্চল তো তাঁদেরই স্বদেশ। সোভিয়েত যে অর্ধ-প্রাচ্য মহারাজ্য। তাছাড়া ভারতবিদ্যার মতো অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা নতুন উৎসাহে অগ্রসর।

ভারতবিদ্যায় ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালা-বিদ্ নভিকভার কথা বলেছি—চেলিশেফ, বারখুদারফ, পড়েছিলেন হিন্দী সম্বন্ধে নিবন্ধ, তাও বলা

হয়েছে। কিন্তু যে প্রবন্ধটি আমাদের বেশি আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের প্রাচ্যবিদ্যাভবনের গবেষক আই, এম্, ওরান্স্কি (Oranski) মহাশয়ের লেখা 'মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত একটি ভারতীয় উপভাষা।' এ সংবাদটা ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা অনেকে তাতে মনোযোগ দিই নি। নিবন্ধটি শুনতে শুনতে তাই কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। ভারতবর্ষের ভাষা অবশ্য ইউরোপের 'জিপ্সী' যাযাবররাও বলে। কিন্তু তাজিকিস্তান ও তৎসংলগ্ন উজবোগস্তানের কোনো কোনো জেলায় ছোটো ছোটো গ্রাম্য গোষ্ঠি আছে—চেহারায়, ধর্মে, ধারণায়, পোশাকে, পরিচ্ছদে, ওসব অঞ্চলের অন্য মানুষের মতো, যাদের সাধারণত বলে 'আফঘোন'। অন্য নামও আছে; হিন্দোস্তানীও একটা নাতিপ্রচলিত নাম। নানা গোত্র, উপজাতিও তাদের আছে; সব শুদ্ধ হয়তো তারা ২।৩ শত পরিবার, হাজার খানেক মাত্র সংখ্যায়। বাইরে তারা তাজিক (ফারসি) ভাষা বলে অনর্গল, ঘরে নিজেদের মধ্যে বলে আর একটি উপভাষা যা পশ্‌তু (আফঘানী) নয় মোটেই, মূলত হিন্দোস্তানী। নিজেদের জাতের বাইরে এরা মেয়েদের বিবাহ দেয়। পুরুষরা বাইরে বিয়ে করলেও জাতি বা ভাষা ছাড়ে না। নিজেদের জাতি ও ভাষাকে তারা বলে 'পর্য' (?) যেমন, 'মে পর্য কৌম' আমি পর্য জাতির মানুষ। 'বৈটা তু উরুসি গাল না-কর, তু পরেয়াসদি গাল কর', বাটা তুই রুশি ভাষা বলিস না, তুই পরেয়া ভাষা বল। নবেম্বর, ১৯৫৪ থেকে এপ্রিল, ১৯৫৯-এ পাঁচ বৎসর ধরে ওরান্স্কি এদের লোক-কথা ভাষা প্রভৃতি নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ সম্মেলনে ভাষার যে দৃষ্টান্ত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি উপস্থিত করলেন তাতে দেখা যায় এদের ভাষার সর্বাপেক্ষা বেশি মিল ভারতীয় ভাষার পশ্চিম হিন্দী উপভাষার সঙ্গে—অবশ্য পশ্চিমা পাঞ্জাবীর (লহন্দার) রূপও কিছু কিছু দেখা যায়। আর পূরবিয়া হিন্দীও বাদ যায় নি, যেমন, 'ছি', 'ছে' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ। 'য়ে অমি (আদমি) ক কাম করিন চি'—ওই লোকগুলো কি কাজ করছে। তবে এসব পূরবীয়া রূপ পশ্চিমাতেও আগে ছিল, এখনো রাজস্তানী, গুজরাতী প্রভৃতিতে আছে। পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গেই তাই হয়ত সম্বন্ধ ছিল এই আফঘোন বা পর্য জাতির সম্বন্ধ।

কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ও সাহিত্যের উপশাখা অপেক্ষা ইতিহাসের ও দর্শনের উপশাখাতেই বিদেশীয় পণ্ডিতদের বেশি আগ্রহ ছিল। এখানকার কয়েকটি

নিবন্ধ ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়—যেমন অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্-এর (Balabushevich)-নিবন্ধ, এ লেভকোভস্কি (Levkovsky)-নিবন্ধ এবং অধ্যাপক দিয়াকফ-এর নিবন্ধ। মোটামুটি আধুনিক ভারতের আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশই এঁদের আলোচ্য। এসব আলোচনা তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উত্থাপন করেছেন, তাতে বিচার-বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। যেমন, দিয়াকফ্-এর নিবন্ধই ধরা যাক্। রুশ ভারতবিদ্‌দের মধ্যে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ। বয়সের অত্যধিক চাপে তিনি প্রায় অচল—তবু ভারতবর্ষে এসেছিলেন একবার। ইতিমধ্যে অবশ্য আর একবার গুরুতর পীড়া গিয়েছে। এখন তাঁর হাত ও মাথা কাঁপে। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসা অফুরন্ত। আর শান্ত ধৈর্যও অফুরন্ত। এ রকম শান্ত ধীর বিচার বিবেচনা, আলোচনার শান্ত উজ্জ্বল পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যেই দেখা যায়। তার উপরে তাঁর ভাষা সর্বদা সংযত, আর কণ্ঠ মধুর। দিয়াকফ্-এর ভাষণ ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্কে। তাতে কংগ্রেস ও গান্ধী আন্দোলনের অনুকূলেই তিনি অনেক কথা বললেও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব খর্ব করতে চান নি। ভারতবাসীরা এ বিশ্লেষণের কেউ কেউ সমালোচনা করেন। একজন বাঙালী অধ্যাপক বললেন—বাঙালী বিপ্লববাদীদের উল্লেখ নেই, এটি মারাত্মক ভুল। তাছাড়া মধ্যবিত্তদের দানের সমুচিত মর্যাদা দেওয়া হয় নি। আর একজন মারাঠী অধ্যাপক নিজের কথা উল্লেখ করে বললেন কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনেই তিনি জেল খেটেছেন। কৃষক আন্দোলনের আরও উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। সুযোগ বুঝে আমিও বলতে ছাড়লাম না—বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলন কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলন, সব ঘাটের জলই তো এ পেটে গিয়েছে —আমরা শিক্ষিতরা গণনীয় বটে, কিন্তু জনতার জোরেই আমাদের জোর। সে জনতার অর্থ ভারতবর্ষে সংখ্যায় প্রথমতঃ কৃষক শ্রেণী, গুরুত্বে শ্রমিক শ্রেণী। নিবন্ধে তাই সুবিচারই হয়েছে। তবে স্বাধীনতার সমস্যা সমূহের কথা (যেমন, দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তুর সমস্যা, ভাষা ও জাতির সমস্যা) উল্লেখ করলে আমরা আরও উপকৃত হতাম। আসলে আমার এ দাবীটাও অন্যায়। কারণ, প্রথমতঃ, নিবন্ধের বিষয়বস্তু তা নয়; দ্বিতীয়তঃ, রুশের মুখে এরূপ সমস্যার আলোচনা ভারতবাসীদের পক্ষে অবাঞ্ছিত মনে হোত। দিয়াকফ্ মহাশয় প্রসন্ন চিত্তে বলেছেন—সমালোচকরা সকলেই বাম-ঘেঁষা সমালোচনা করলেন। সমালোচনাই। আসলে বিশ মিনিটের নিবন্ধে ভারতীয় আন্দোলনের মূলরূপই শুধু

নির্দেশ করা সম্ভব, তার মহাকাব্যিক মহিমা ব্যক্ত করা যায় না। আজও তো বাঙলার বাঙালীরাই নিজেদের দানের ইতিহাস লিখতে পারল না। ওদিকে কংগ্রেসের রাজত্বে যে ইতিহাস লিখিত হচ্ছে বিদেশীয়রা তা থেকে সম্পূর্ণ বা যথাযথ চিত্র পাবেন কি করে? রুশ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্বে ছিলেন পৃথিবীতে একঘরে, ইতিহাসের সকল উপাদান তাদের হাতে নেই।

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক অন্যান্য আলোচনায় দেখেছি বিদেশীয় পণ্ডিতেরা যতটা উৎসাহী, আমাদের প্রতিনিধিরা অনেকেই তত আগ্রহান্বিত নন। বিদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী, জার্মান অনেকেই থাকতেন। 'পাবলিক সেকটর' থেকে কমিউনিটি প্রোজেকট—নানা কথাই উঠত, তবে মতামত প্রকাশে সাধারণত বিদেশীয়রা সকলেই নিরস্ত থাকতেন। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা অবশ্য আধুনিক ভারতের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়েই বেশি অভিনিবিষ্ট। কিন্তু কিছু কিছু নিবন্ধ ছিল পুরনো বিষয়েও—যেমন, জি বনগার্দ লেভিন (Bongard Levin) এর নিবন্ধ মেগেস্থানিসের বিবরণ ও অশোকের শিলালিপির তুলনামূলক আলোচনা, এল্, এম্, গমযুনভ ও এ, উলিয়ানভস্কি (Gamayunov ও Uleyanovsky) মহাশয়দের লেখা কার্ল মার্কসের সম্মিলিতজোত সম্বন্ধে বিতর্কমূলক আলোচনা। তবে, সাধারণভাবে বলা যায় —প্রাচ্যবিদ্যার প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর্ব উদ্‌ঘাটনে বিশ্লেষণে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও ভারতীয় পণ্ডিতরাই উৎসাহী। আসলে এতদিন পর্যন্ত তারই নাম ছিল প্রাচ্য-বিদ্যা; তার সঙ্গে থাকত কিছু কিছু আধুনিক নৃবিজ্ঞানের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিবরণ। যে প্রাচী মরে ভূত হয়ে যায় নি সে প্রাচী ছিল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের চক্ষে তুচ্ছ, অনাদৃত। কারণ তা রাজনৈতিক সামাজিক শোষণের বস্তু, জীবন্ত জিনিস। তা নিয়ে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা যখন সঙ্গত নয়, তখন তা পণ্ডিতদের অস্পৃশ্য। ঠিক উল্টো নির্দেশ দিয়েছিলেন লেনিন—জীবন্ত-প্রাচীই প্রধান আলোচ্য, কারণ, তার জীবনলাভে মানুষের ইতিহাসে রূপান্তর অনিবার্য। এ জন্যেই সোভিয়েতে আধুনিক প্রাচ্যবিদ্যাই হচ্ছে প্রাচীর গণনায় প্রধান। এতদিন প্রাচ্যবিদ্যার মুখটা ছিল পশ্চাৎ দিকে; মস্কোতে যেন প্রাচ্যবিদ্যার মুখ এবার প্রাঙ্‌মুখী হয়ে গেল—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতেই যাচ্ছে প্রাচ্যজগতের দৃষ্টি। এইটিও মস্কো সম্মেলনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েতের ভারত-চর্চা

এখানে অবশ্য উল্লেখ করা সম্ভব নয়—সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্‌রা কী বিপুল উদ্যমে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণায় অগ্রসর হচ্ছেন। সমগ্র প্রাচ্যবিদ্যা তো দূরের কথা, শুধু ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রেও সোভিয়েত প্রচেষ্টার সংবাদ রাখা দুঃসাধ্য। নিত্য নতুন প্রাচীন ও নূতন গ্রন্থের অনুবাদ গবেষণা-নিবন্ধ ও আলোচনায় সোভিয়েতের ভারতবিদ্‌রা সর্বদা ব্যস্ত। সে হিসাব থাক; এদিকে দু' একটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে—সে বিষয়ে তাঁদেরও চোখ পড়া প্রয়োজন;—এ প্রসঙ্গে তা-ই উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা কথা মনে হয়—লেনিনের নির্দেশ মতো সোভিয়েত বিদ্বানরা আধুনিক ভারতের আলোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু সে পরিমাণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত সম্বন্ধে গবেষণায় অগ্রসর হতে পারেন নি। আচার্য শ্চারভাৎস্কির মতো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সর্বদা জন্মে না। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতবিদ্যার আলোচনায় তাঁর পরে তাঁর দেশে একটা ছেদ পড়েছে। অধ্যাপক কালিয়ানফ্ প্রভৃতি তাঁর একালের ছাত্ররা সংস্কৃত বিদ্যার দীপটি কোনো রূপে জালিয়ে রেখেছেন, এ কথা তাঁরাও বোঝেন। এক নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল যখন ওয়াই, এন্, রোয়েরিথ তাঁর পিতৃভূমিতে এসে পুনর্বসতি করলেন। তিনি ছিলেন তিব্বত মঙ্গোলিয়া ও মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বৌদ্ধধর্ম ও ভারতের অনুরাগী। কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে না করতেই অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হল—এই সম্মেলনের মাস তিন চার পূর্বে। (রোয়েরিথ-এর নামে সম্মেলন সময়েই মস্কোর প্রাচ্যবিদ্‌রা একটি বিশেষ গবেষণা প্রকোষ্ঠ স্থাপন করেছেন)। ইং ১৯৫৮ সালে ভারতবিদ্ ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ডাঃ রাঘবন প্রমুখদেরও মস্কোর কর্তৃপক্ষ সাদরে আমন্ত্রিত করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল—তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন করে প্রাচীন ভারতবিদ্যার গবেষণা পুনর্গঠন করবেন। সে পুনর্গঠন আরম্ভ হয়েছে কিনা জানি না। নিশ্চয়ই তা সময় সাপেক্ষ, বিশেষ করে যখন নতুন করে ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে। সে জন্যে অর্থানুকূল্য ছাড়াও চাই—সময়; চাই মেধাবী ও অনলস গবেষকমণ্ডলী।

কিন্তু এই সময় ও সুযোগ সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যার পরিচালকরা এখন পাবেন কি না জানি না। কারণ, প্রথমতঃ প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক পৃথিবীর দাবী তাঁদের চক্ষে অধিক। আর লেনিনের নির্দেশ মতো আধুনিক

সকল জাতি, সকল সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁরা আগ্রহবান। গত দু'বৎসরের মধ্যেই এশিয়া আফ্রিকার জাতিদের অভাবনীয় অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে। তার ফলে সোভিয়েত ছাত্র ও মনীষীদের কাজের এক বিরাট এলাকা অকস্মাৎ প্রসারিত হয়ে গিয়েছে—তা আফ্রিকেয় বিদ্যা। যুগের এই দুর্নিবার দাবী পূরণ না করে পূর্ব যুগের দায়শোধের জন্য বেশি উদ্যোগী এখন সোভিয়েত বিদ্বানরা হতে পারেন না। বাধ্য হয়েই আধুনিক পর্ব ছাড়িয়ে পুরাতন পর্বে তাঁরা তেমন অধিকার স্থাপন করবার সুযোগ পান নি। অবশ্য যাঁরা মহাভারত, কৌটিল্য, মনু প্রভৃতি অনুবাদ করেছেন তাঁরা সে বিষয়ে উদাসীন নন; তা না বললেও চলে। অন্যদিকে দেখছিলাম—আকাদেমিনিয়ান ভাসিলিস্ত্রুভে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের সুমের দলিলপত্র নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত। এইফ্‌গোন বেলায়েভ প্রাচীন আরব্য গবেষণায় তৎপর। কিন্তু আজকের এই বিপ্লবী যুগ তাঁদের অবাধ অবকাশ আর দেবে না—সম্ভবতঃ এই সত্য বুঝেও তাঁদের প্রাচীন পর্বের উপর এরূপ অধিকার বিস্তার করবার কথা ভাবতে হবে। মনীষার অভাব নেই। প্রয়োজন প্রস্তুতির। কারণ, বিজ্ঞানের ঐতিহ্য-সৃষ্টি অপেক্ষাও পুরাতত্ত্বের ঐতিহ্য-সৃষ্টিতে বেশি সময়ই লাগবার কথা—কারণ, প্রাচীনকালের উপাদান অতটা সুনিশ্চিত নয়।

গবেষণাক্ষেত্র বিস্তারের জন্য সোভিয়েতের উপর যুগের যে অলঙ্ঘ্য দাবী আমরা দেখছি, তার ফলেই গবেষণা ক্ষেত্রে সোভিয়েত 'গবেষক' মণ্ডলীর আর একটি বাধাও জুটছে। বিষয় ব্যাপ্তির এই তাগিদে গবেষণার বিষয়ের গভীরতর প্রদেশে তাঁরা অগ্রসর হতে পারছেন না। অনুসন্ধানে, বিচারে তাঁদের গবেষণা তাই কখনো কখনো অসম্পূর্ণ, কখনো কখনো বা নির্ভুল নয়। তাঁদের কোনো কোনো অভিধান ও কোনো কোনো গবেষণাতে অল্পাধিক ত্রুটি থেকে যায়। সময়, সুযোগ, বিষয়-পরিচয় আর গবেষণার ঐতিহ্য সুস্থির ও গভীর হয়ে উঠলে তা দূর হতে বাধ্য। কিন্তু কালের দাবী যেরূপ ভাবে সোভিয়েত পণ্ডিতদের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের দিকে এমন ঠেলে নিয়ে চলেছে—তাতে তাঁরা পূর্ব পূর্ব অবসর-বহুল যুগের মতো সুযোগ পাবেন কি? সমস্যাটা এখানেই।

এ সত্ত্বেও সোভিয়েত পণ্ডিতদের অসামান্য কৃতিত্ব কারো চক্ষে না পড়ে পারে না। ধরা যাক ভারতবর্ষের কথা! দু'শ বৎসর ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছে—এদেশের শোষণেই তাদের সৌভাগ্য! ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্‌রাও কম

পণ্ডিত ছিলেন না—ভারতবর্ষকে তাঁরা সর্ব রকমেই জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে সুযোগ জার আমলে বা সোভিয়েত আমলে রুশ দেশের কেউ পায় নি, এখনো পায় না। তবু ইংলণ্ডের লোকের নিকট ভারতবাসী ও ভারত-সংস্কৃতিকে পরিচিত করবার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজরা দু শত বৎসরে? আর, সে তুলনায় এই চল্লিশ বৎসরে লেনিনের শিষ্যরা কী কাণ্ডই না করেছেন! সোভিয়েতের আপামর নরনারী সকলের কাছে ভারতবাসীকে ও ভারত-সংস্কৃতিকে তাঁরা পরিচিত করতে চেষ্টাপর। অক্লান্ত তাঁদের চেষ্টা, মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য—দু' দেশের মানুষের কাছে মানুষকে পরিচয়-সূত্রে আত্মীয় করে তোলা। আর শুধু কি ভারতবর্ষ সম্পর্কেই তাঁদের এ চেষ্টা! মস্কোর হোটেলে দাঁড়িয়ে পূর্বেও মনে হয়েছিল, এবার প্রাচ্যবিদ্যার মহাসম্মেলনে আরও সুস্পষ্ট অনুভব করলাম—পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে এমন করে সকল জাতিকে জানবার ইচ্ছা, সকলের ভাষা শিখবার আয়োজন আর হয় নি—যেমন হয়েছে মস্কোতে। মানুষের সকল উত্তরাধিকার —"entire inheritance of humanity" সত্যই আজ লেনিন-শিষ্যদের লক্ষ্য। কালচার বা সংস্কৃতিকে যাঁরা জনগণের সম্পত্তি করতে কৃতসংকল্প, প্রাচ্যবিদ্যাকেও তাঁরা শুধু মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ও গবেষকদের সম্পত্তি করে রাখছেন না। আর প্রাচ্য জাতিরাও তাঁদের চক্ষে শুধু গবেষণার উপাদান নয়, পুরাকালের প্রমাণ নয়,—জীবন্ত পৃথিবীর সহযাত্রী। এইটিই সোভিয়েত গবেষণার বৈশিষ্ট্য।

সম্মেলনের সংযোগ-ক্ষেত্রে

অবশ্য একটা কথা: আমি মার্কা-মারা ভারতবিদ্ নই। ওসব বিদ্যার সম্বন্ধে আমার আছে হয়তো সাংবাদিক-সুলভ কৌতূহল আর মার্কসবাদ-প্রাণিত ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা। তাই বিপুলা সে প্রাচ্যবিদ্যার পৃথিবীর কতটুকু জানি, দেশের বাইরে যার পা বাড়ান দুঃসাধ্য আর বিদ্বান ও মনস্বীদের বহু সাধনধারাই যার অজ্ঞাত? মস্কোতে বিশ্বসম্মেলনে আমার দৌড় ছিল ভারত-বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট বক্তৃতা-গৃহ দুটি পর্যন্ত। বিশটি বিরাট শাখার সংবাদ অবশ্য কারও একা সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনাগারে কিংবা মিলন উৎসবের ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে; নিজের পরিধির বাইরেও তখন এক-আধবার প্রাচ্যবিদ্যার অন্য অঞ্চলের

দিকে দৃষ্টি না পড়ে পারে না। কিন্তু সে জন্যও চাই আগ্রহ আর কিঞ্চিৎ প্রস্তুতি। শুধু আগ্রহ ওই দ্বিতীয় বস্তুটির অভাব মেটাতে পারে না, তা আমি অন্ততঃ পদে পদে উপলব্ধি করেছি। দ্বিতীয় প্রাতরাশের বেলাই আমি তা বুঝতে পারলাম। ভোজ্যবস্তু চোখে দেখলেও আমি তখন বিপন্ন—রুশ ভাষা জানি না, চাইতে পারি না। আমার বিপদ দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাশে এসে বসল একটি তরুণ মার্কিন যুবক—রুশ ভাষা তার জানা—তার গবেষণার বিষয় জানলাম মধ্য যুগের মধ্য এশিয়া। গত রাত্রি সে কাটিয়ে এসেছে জলে বৃষ্টিতে ককেশিয়ার এক পাহাড়ে। সে আমার থেকে জানতে চায় ভারত ও মঙ্গোলিয়ার সম্পর্কে। ডাঃ রঘুবীরের নাম তাঁর অধ্যাপকরা তাঁকে বলে দিয়েছেন। জানতাম ডাঃ রঘুবীর সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত, পার্লামেণ্টের সদস্য, সংস্কৃতওয়ালা। ডাঃ রঘুবীর কয় বৎসর পূর্বে মঙ্গোলিয়া থেকে বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র উপঢৌকন নিয়ে এসেছেন; কিন্তু তা সরকারী সংগ্রহশালায় যায় নি; গিয়েছে তার নিজস্ব এক গবেষণাগারে। এই গবেষণাগারের ভাগ্যে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হয় নি—যেমন কলকাতারও কোনো কোনো সংস্কৃতি-ভবনের তা হয় না। তাতে আপত্তির কারণ নেই—রঘুবীরের নামও মার্কিন মহলে সুবিদিত। কিন্তু তিব্বতী ব্যাপারে ডাঃ রঘুবীর যেরূপ চীন-বিরোধী উগ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর 'নেতা' হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ হয় বৈ কি—অর্থ জিনিসটিতে অনর্থ ঘটায়। আমি কিন্তু ডাঃ রঘুবীরের সম্বন্ধে বীতরাগ অন্য কারণে—ডাঃ রঘুবীর ও গোবিন্দদাস প্রমুখদের ইংরেজি নিধনের উগ্রতা ও "সংস্কৃত-হিন্দ-হিন্দী"র অতিপ্রচার ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে অনেক বেশি মারাত্মক। বিশেষ করে আসামের পরে ভারতীয় ঐক্যের কথা সর্বদা চিন্তনীয়। বলা বাহুল্য ডাঃ রঘুবীর এ সম্মেলনে আসেন নি। চীন পণ্ডিতেরাও এ সম্মেলনে ছিলেন না, মঙ্গোলিয়ার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান শূন্য—গতবার (১৯৫৮) অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হলেও উলান বাতোর বিমানক্ষেত্র দিয়ে চীন চলে যাই। এবার সুনীতিবাবু মঙ্গোলিয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এখন মস্কোতে সদ্যপ্রত্যাবৃত—ছাত্রটিকে তাই তাঁরই উদ্দেশ দিলাম। কিন্তু সম্মেলনের বিরাট সাগরে সে ছেলেটি অধ্যাপক মহাশয়ের সন্ধান পায় নি, তা বুঝেছি। আমি সেদিন সে আধঘণ্টায় পেলাম এক ধরনের নূতন মার্কিন গবেষকের পরিচয়—সহজ স্বচ্ছন্দ আলাপ-উদ্যোগী ভালো ছেলে; জানলাম তার গবেষণা-শাখার দু-একটি কথা।

এমনি পরিচয় হয়ে গেছল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আর-একটি যুবক প্রতিবেশীর সঙ্গে—পূর্ব-জার্মানীর সে ছাত্র-গবেষক। মার্কিন যুবকটির তুলনায় কথা বলে স্বল্প; আলাপে ইচ্ছুক হলেও উদ্যোগী কম, কিন্তু জিজ্ঞাসা তার বেশি। তার বিষয় মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই কি জিজ্ঞাসা তার সামান্য? সংস্কৃত শেখার কল্পনাও যে তার মাথায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তা মুখে না বললেও বুঝতে কষ্ট হল না।

এ সব ছাত্র-গবেষকদের এই বিশ্বসম্মেলনে দেখে আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে। আমাদের দেশেও যুবক গবেষক আছে। সম্ভবত তারা বুদ্ধিতে-জিজ্ঞাসায় এদের অপেক্ষা খাটো নয়। অবশ্য যে ভাবে দেশে শিক্ষার অধোগতি চলেছে তাতে ওই বুদ্ধি ও আগ্রহ দুইই খর্ব হতে বাধ্য। যাই হোক, তারা কি এ ভাবে পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিদ্যার গবেষণার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে? তাঁদের সচেতন করেছি কি আমরা তাঁদের অগ্রজরা—কিংবা নিজেরা হয়েছি সচেতন—যাঁরা অধ্যাপক, যাঁরা বুদ্ধিজীবী? আমার কেন, আমাদের অধিকাংশেরই তো মনের দৌড় ভারতবিদ্যা পর্যন্ত—'বৃহত্তর ভারতই' বা কয়জনার জিজ্ঞাস্য? অবশ্য 'ফরেন্ সার্বিসের' আকাঙ্ক্ষায় কেউ-কেউ আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী ভাষা এখন শেখেন। আর একটা কথাও মনে উঠেছে—বিদেশের ছাত্র-গবেষকরাও এরূপ বিশ্বসম্মেলনে আসতে পারে, আমাদের ছাত্ররা কি পেত এমন সুযোগ? ছাত্র থাক, আমরাই পাই ক'জনা, কতটুকু? মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেছি—যে দেশে নিরক্ষরতা এখনো চেপে আছে শতকরা ৭৫টি মানুষের ওপর, আর দারিদ্র্য এখনো যাদের স্বাস্থ্যনাশী মনুষ্যত্বনাশী, আপাততঃ তাদের ছাত্ররা এ সুযোগ নাই বা পেল—শুধু ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য সুযোগ এখনো উন্মুক্ত থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু যে-কোনো বিদ্যা-অবিদ্যার নামে বিদেশ যাত্রার সুযোগ ও 'ফরেন একস্‌চেঞ্জের' সুবিধা অবাধে বিতরিত না হলে একথা মনকে বোঝাতে পারতাম।

সান্ত্বনা কোথায়? শুনলাম সেই সত্যনারায়ণ সিংহ 'রোমাঞ্চকর রাশিয়া'র ভ্রমণ-লেখক, আর ভূতপূর্ব 'এম-পি', আর তিব্বতের বিদ্রোহ প্রভৃতি সেখানকার যত বিদ্রোহের, প্রেমের ব্যাপারের আত্মপ্রচারিত নায়ক, প্রেমিক, ইত্যাদি—তিনিও তখন মস্কোতেই ছিলেন। একদিন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের হোটেলে হানা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। এঁদের অবশ্য

কিছুতেই বাধা নেই—না পথে, না কথায়।—মস্কো, মস্কা সব পথই এঁদের নিকট উন্মুক্ত, আর রিপোর্টও তেমনি।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল—সম্মেলনের পরে একদিন উক্রেনিয়া হোটেলে আমারই প্রাতরাশের টেবিলে সঙ্গী হলেন একজন শিষ্ট, সংভাষী, মার্কিন যুবক। পরিচয় হল। নামটি তাঁর শুনেছিলাম মনে হল। কথা বলতেই জানলাম—হাঁ, 'কমিউনিজম ইন্ ইণ্ডিয়া' নামক বিরাট বইখানার অন্যতম লেখক তিনি—জেনে, ডি, ওভারষ্ট্রীট (Over-street), সোয়ার্থমোর কলেজের অধ্যাপক। মস্কোতে তিনি আছেন বিশেষ করে ওই বই-এর সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে, গবেষক হিসাবে। মাস দুই প্রায় থাকবেন, সময় শেষ হয়ে আসছে। বেশ ভদ্র মানুষ। কিন্তু তাঁর লিখিত বই থেকে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, তিনি কমিউনিজম নামক 'দানব-বিত্তার' বিরোধী পক্ষই। অথচ, মস্কো সমস্ত গবেষণাগারই তাঁর নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভাবলাম—এ সুযোগ কি মার্কিন রাজ্য দিতেন কোনো উল্টোপক্ষীয় গবেষককে? হয়তো আকাশের ইউ-টু যাদের চোখে পড়ে এসব নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। কিন্তু লৌহ যবনিকাটা কোথায়? এটলান্টিকের এপারে না ওপারে?

যাক, এ হচ্ছে পরের প্রসঙ্গ। সম্মেলন সময়ে ভোজন গৃহে আরও যাঁদের সঙ্গে নতুন আলাপ হয় তাঁরা দুজন ছিলেন শিষ্টাচার-সুদক্ষ জাপানী, না হলে অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য দেশীয়। এদিকে-ওদিকে সম্মেলনের ফাঁকে-ফাঁকে কেউ সস্ত্রীক, কেউ একা, সবাই মস্কো দেখছিলেন, কেনা-কাটাও করছিলেন। সোভিয়েত দেশে এখন চারদিকে প্রাচুর্য; দেশের প্রত্যেকেরই হাতে টাকাও যথেষ্ট। আর, ভবিষ্যৎ নিয়ে ওদেশে যখন দুর্ভাবনা নেই, তখন টাকা হাতে এলেই টাকা খরচ করবার জন্য ওদেশের মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। দোকানের কিউ'র শেষ নেই,—ক্রেতার ভীড়, সত্যই যেন প্রতিদিন প্রতি দোকানে 'পূজার বাজার।' আমি অবশ্য একদিন মাত্র অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ সময়ে বইএর দোকানে যেতে পেরেছিলাম—ওঁর সংসর্গে ছবি ও ছবির বইও কিনে ফেলেছি। তাছাড়া, আমরা ভারতীয়রা সবাই পনেরই আগস্ট আমাদের দূতাবাসে গিয়েছিলাম পতাকোত্তলন উৎসবে—দূতাবাসে স্বয়ং রাজদূত মেনন মহাশয় আর দূতাবাসের কর্মচারীদের উদ্যোগে অমায়িকতায় সেদিনটি চমৎকার উদ্‌যাপিত হয়েছিল। পরদিন ছিল

মধ্যাহ্নাহারের নিমন্ত্রণ। বন্ধুকৃত্যও করেছেন অন্যদিন বীকভা ও নভিকভা। না হলে সম্মেলন ক্ষেত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট পরিধিতেই ছিল আমার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের রান্না একাধিক রাত্রিতে খেয়েছি, ঘরে আড্ডা জমিয়েছি। তারপর গভীর রাত্রে তাদেরই চালনায় সেই বিশাল সৌধের গোলকধাঁধা থেকে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে।

দুদিন শনি ও রবিবার (১৩।৮।৬০, ১৪।৮।৬০) সম্মেলন বন্ধ ছিল—এবার মস্কোতে এ দুটি দিনই ছিল নির্মেঘ—না হলে আগষ্ট নাকি ওদের হেমন্তে পরিণত হয়েছিল। এ দুদিন অনেকে লেনিনগ্রাদে বা অন্য কোথাও ভ্রমণে-দর্শনে যাবেন। আমার কাটল মস্কোর নিকটস্থ দুটি জায়গা দেখে। শনিবার ঝাগোর্‌স্ক মনাষ্টারি দেখতে গেলাম শ্রীমতী নভিকভা ও লেনিনগ্রাদের প্রাচ্যবিদ্যাভবনের বাঙলার কর্মী শ্রীমতী ইরা খতোভিদোভা'র সঙ্গে—দু'জনাই পূর্ব-পরিচিতা। আর সেই যাত্রী-বাসে হঠাৎ ইংরাজী-ভাষী দেখে পরিচয় হল যাঁর সঙ্গে তিনি জন আরুইন—সঙ্গে মিসেস আরুইন। কবি সমর সেন তাঁকে খুঁজতে এসে সম্মেলনে দেখা পান নি, তা জানালাম। তিনিও সমর সেনের টেলিফোন নম্বর নিলেন। আরুইন দম্পতি কলকাতার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রীতি নমস্কার জানালেন। যথেষ্ট প্রীতিপ্রদ হল আলাপ। ঝাগোর্‌স্ক-এর খ্রীষ্টীয় মঠ, গির্জা কয়টি ও সংযুক্ত শিল্প সংগ্রহ-শালা আমি পূর্ববারে (১৯৫৮তে) সুনীতিবাবুর সঙ্গে ভালো করে দেখেছিলাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মস্কো অঞ্চলে এখানেই খ্রীষ্ট সাধুদের প্রথম আবির্ভাব হয়। এখনো মঠ চলছে, গির্জাগুলিতে উপাসনা হয়—বড়টিতে তখন হচ্ছিলও—সংলগ্ন পাদ্রি-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা এখনো ১৯৫৮-এর সমানই আছে—প্রায় ১৮০। কিন্তু গির্জা-মঠ প্রভৃতি বন্ধ নয়। এবার আমাদের এসব দেখতে হল বড় ভীড়ের মধ্যে, একটু তাড়াতাড়ি করে—সেবারের মতো তৃপ্তি হল না। পরদিন শ্রীমতী নভিকভার সঙ্গে আমি দেখতে গিয়েছিলাম মস্কোর সন্নিকটে কলোন্‌স্‌কায়া প্রাসাদ। পুরনো গির্জা, জারদের পুরনো প্রাসাদ, আর পুরনো বস্তুর সংগ্রহশালায় এ জায়গাটিও চমৎকার।

জন থাকুইন, অধ্যাপক বাসম প্রভৃতি সেদিনও ছিলেন সহযাত্রী। প্রাচীনতম গির্জাটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ডাঃ বাসম আমাকে বললেন, "এ সব জিনিস আপনাদের পক্ষে দেখবার জিনিস নয়।" কথাটা বুঝে আমি বললাম, "হাঁ, এরা এক হিসাবে নতুন জাতি। সুবিধাও তাই অনেক।"

"সুবিধাটা কি ?" আমি জানালাম, "অতীতের বোঝাও কম ভারী নয়।" "তাতে কি যায় আসে ? আপনারা আরম্ভ করেছেন চলতে—আপনারাও এগিয়ে যাবেন।" আমি বললাম, "হাঁ, সে আশাই করছি। কিন্তু দেখেছেন তো আমাদের বোঝাটা। দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথর—ঠেলেও যেন নড়ান যায় না, আবর্জনায় যেন পথ ঢেকে রয়েছে।" বাসম একটু খোশমেজাজি ভাবে বললেন, "দারিদ্র্য ? তা এদেরই কি নেই ? গিয়ে দেখুন একটু শহরের বাইরে। আর জঞ্জাল আবর্জনাই কি কম ?" তর্ক করলাম না; কিন্তু একথা সত্য হলেই বা সান্ত্বনা কোথায় আমাদের পক্ষে ? সত্যই, আমাদের গরীব আর রুশিয়ার গরীবের কি আজ তুলনা হয় ? তা ছাড়া, নিশ্চয় এদেশেও জঞ্জাল আছে। কিন্তু মস্কোর পথ ঘাট দেখে মনে হয় আজ মস্কো পৃথিবীর একটি প্রধান পরিচ্ছন্ন নগর। আর কলকাতা—আমার প্রিয় শহর কলকাতা! যাই হোক, অধ্যাপক বাসম ভারতের প্রতি সহৃদয়, হয়তো মমতাবান। তাঁর মতো প্রাচ্যবিদরা অনেকেই বড় সহজেই মনে করেন—শত জটিলতার পাকে-জড়ান ভারত-জীবন বুঝি সহজ ভাবেই নবায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি যে দেশ থেকে সদ্য দেখে আসছি আসামের আত্ম-ভ্রষ্টতা। আমরা যে বুঝি—আমাদের গতিবেগ আরও না বৃদ্ধি পেলে আমরা পৃথিবীর হাটে সব থাকতেও অসহায় হয়ে থাকব। পৃথিবী দুর্জয় গতিতে এগিয়ে চলছে—প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন শেষ না হতেই 'স্পেসশিপ' জীবজন্তু নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমণ করে এল—ওলিম্পিকের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ডাক পড়ল যৌবনের পরীক্ষার। অধ্যাপক বাসমের মতোই সোভিয়েত প্রাচ্যবিদদের সদিচ্ছা ও সাধুবাদ মস্কোতে এত শুনেছি যে, এসব কথা স্মরণ করা যেমন প্রয়োজন, আত্ম-পরীক্ষা তত বেশি আবশ্যক।

সেখান থেকে ফিরে মধ্যাহ্ন-আহারান্তে একবার অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর গৃহিণী মহোদয়া ও শ্রীমতী এফগেনিয়া বীকভার সঙ্গে মস্কো নদীতে ষ্টিমারে ভ্রমণে বার হলাম। উঠলাম উক্রেনিয়া হোটেলের সামনেকার ঘাট থেকে আর শেষ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরলাম সেখানে ঘণ্টা দুই পরে। তখন রৌদ্র পড়ে আসছিল, শেষ দিককার হাওয়ায় আমি তো ষ্টিমারের কোটরে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু বেশ লাগল মস্কো নদীর এই যাত্রা।

এ সব ভ্রমণ ও দর্শনের সুযোগ আমার এ সময়ে বেশি মেলে নি। তবে মেলা-মেশার যেসব সুযোগ লাভ হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

সান্ধ্যকালীন সম্বর্ধনা-সম্মেলন সমূহ। একাদেমি ভবনের একটি সম্মেলনের কথা বলেছি। ১৫ই আগষ্টে আমাদের স্বাধীনতা দিবসে মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা ভবনের ভারত-শাখা আর একটি সম্বর্ধনা সম্মেলন করেন মস্কো হোটেলে। আর ১৬ই সন্ধ্যায় ক্রেমলিন প্রাসাদে বিজ্ঞান একাদেমি করেন রুশ ও বিদেশীয় প্রতিনিধি, অতিথি-অভ্যাগত, সকলের এক বিরাট সান্ধ্য-সম্মেলন। প্রাসাদের তিনটি হল জুড়ে আয়োজন। সমারোহে আহার্যে পানীয়ে তা যে রাজসিক ব্যাপার তা না বললেও চলে। এ উপলক্ষে দেখতে পেলাম ক্রেমলিন প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ জারদের প্রাচীন বাসগৃহ, উপাসনা-স্থল, বেদি ও দেব-পট, আর বিশ্রাম গৃহ প্রভৃতি। দেখবার মতো বটে—বঙ্গসন্তানের কল্পনাতীত হলেও স্বপ্নভঙ্গও তাতে ঘটে। যতটা বিলাস-বিভ্রম আছে, ততটা আরাম বা সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত হয় নি। লোকারণ্যে নতুন পরিচয় বেশি হয় নি সে সন্ধ্যায়। সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট কনস্তান্তিন অস্ত্রোভিতিয়ানফ স্বাগত করলেন সকলকে। অভ্যাগতদের পক্ষ থেকে জন চার নেতা প্রতিভাষণও দেন। প্রথম বোধহয় বললেন ইথিওপীয়ার প্রতিনিধি; তারপরে সৌদি আরবের (?)। তারপরেই ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বললেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজিতে তিনি অধিবেশনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলে—উপনিষদের প্রার্থনা আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করে দিলেন : "সহনো ভবতু সহনো ভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ,

তেজস্বিন্ নবধীতম্ অস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।

আর শেষ করলেন, "শ্লোভো ওপুল্ক্‌ ইগরেভে" থেকে একটি প্রাচীন রুশ কথা উদ্ধৃত করে—তার অর্থ : "প্রাচীন যুগের যা গৌরবের আমরা তা ধরে রাখব। আর, ভবিষ্যতের যে আরও মহত্তর গৌরব সেটুকুও জয় করব।" প্রাচ্যবিদ্‌দের সাধুবাদ মাথায় তুলে নিয়ে আমাদেরও এই মন্ত্রই জপ করা প্রয়োজন। মহত্তর গৌরব জয় করতে হবে। সকল দেশেরই অবশ্য এই আদর্শ। তাই সেদিনের সম্বর্ধনা সভা এই ভাষণের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে—ভারতবাসী হিসাবে তাতে অবশ্য গৌরব বোধ করাও স্বাভাবিক।

হয়তো অধ্যাপক সুনীতিকুমারের এই ভাষণের প্রস্তুতি এক হিসাবে হয়ে গিয়েছিল ঠিক ঘণ্টা দুই পূর্বের বিশ্বসম্মেলনের ২৫শ অধিবেশনের সমাপ্তি সভায়। তাতে ভারতবর্ষ আগামী বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করছে, শুনতেই দীর্ঘস্থায়ী করতালি ও তুমুল হর্ষধ্বনি উঠেছিল সমগ্র গত-প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে।

সবাই হয়তো জানতেন না, কিন্তু নেতৃপক্ষ সকলেই জানতেন—দু'দিন ধরে এ নিয়ে একটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল—কে আগামী অধিবেশনের ভার গ্রহণ করবে। শুনেছিলাম—পূর্বে ভারত চেয়েছিল এই অধিকার। কিন্তু তারপর শোনা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা দাবী করবে। তখন ভারতীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী জানিয়ে দেন—যুক্তরাষ্ট্র যখন চাইছে তখন আমরা আর দাবী করছি না। কিন্তু মস্কোতে সম্মেলনের কর্তৃমণ্ডলীতে যখন প্রশ্ন উঠল তখন একই দাবী করে বসল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে, আর এক দিকে মিশর। কেউ দাবী ছাড়েন না। দু পক্ষেই দর হাঁকলেন—যুক্তরাষ্ট্র বললেন, প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ দোব। দুপক্ষেই দলভারী করতে থাকেন—বলেন ভোট হোক। ভোটে এসব স্থির করা বাঞ্ছনীয় নয়—নিরপেক্ষরা তাই অনেকেই ভোটে অসম্মত। রীতিমত 'শীতল-সংগ্রামের' হাওয়াই যেন বইতে আরম্ভ করল ; দু-দিন যায় এভাবে। শেষদিনে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের রাজদূত মেনন মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। স্থির হল—এ সংকটে ভারতবর্ষেরই এই নিমন্ত্রণ-দায়িত্ব নেওয়া উচিত—যদি সকলে তাতে সম্মত হয়। কর্তৃমণ্ডলীর সভায় এ কথা উঠতেই তা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল। সেদিনের দূতাবাসের মধ্যাহ্নাহারে—এই ঝামেলা চুকিয়ে আসতে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের তাই বিলম্বও হয়ে গিয়েছিল। অপরাহ্ণে সমবেত প্রতিনিধি সভা বসল—যেখানে উদ্বোধন হয়েছিল সেখানে—ডাক্তার গফুরফ সভাপতি। সভায় তো একটু দেরিতে এসে আমি দাঁড়াবার জায়গাই প্রায় পাই না। এর পরে যখন ঘোষিত হল—ভারত আগামী ২৬শ বিশ্বসম্মেলনকে আমন্ত্রণ করছে, তখন সেই বিপুল সম্বর্ধনা। আমাদের ভারতবিদ্ রুশ বন্ধুরা তো আনন্দে আকুল। আমার নিকটে ছিলেন একগেনিয়া বীকভা ও আরও কয়েকজন, তাঁরা নাচতে বাকি রাখলেন আনন্দোচ্ছ্বাসে।

ভারতবাসী হিসাবে আমাদের তাই গৌরব এই বিশ্বসম্মেলনে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দায়িত্বও কম নয়। মস্কোতে প্রাচ্যবিদ্যার যে তিনটি বিরাট বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছে তাকে পরিপোষণের দায় আছে ; আর অন্য দিকে প্রাচ্যবিদ্যার ও শীতল-সংগ্রামের ঝাপটা দেখা দিচ্ছে, তা থেকেও রক্ষা করতে হবে এই বিশ্বসম্মেলনকে। এও একটা পরীক্ষা।

সমাপ্ত

এ জন্মের চালচিত্র

কুমারেশ ভট্টাচার্য

আরও কেউ কেউ, যারা ওপাশ দিয়েই যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকগুলো লোকের সামিল হয়ে দাঁড়াল। সামিল হয়ে দাঁড়াল অথবা হেঁটে চলার হাত এড়িয়ে অবশ হয়ে গেল। জমে থাকা মানুষের বৃত্তটা আরও একটু বাড়ল। কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। অনেকেরই ধারণা—এই রকমই হয়। কোন কথা নেই, উক্তি না ; শব্দও না। শুধু একটা গুঞ্জনের মতো, কিন্তু সুরের নয়, ভাষার নয়, অনেকগুলো বুক আর মনের ইচ্ছার। অথচ কেউ কিছু বলছে না। সবারই যেন জানা আছে—'এই রকমই হয়'।

শব্দগুলো সরু হয়ে যায়, হাওয়ার ভেতরে সমস্ত জায়গাটা আল্‌তো করে ছুঁয়ে থাকে। মানুষগুলো পদ্মফুল। পদ্মফুল হাওয়ায় কাঁপে, দোলে, তবু চিন্তার ভ্রমরকে ডাকতে হয় না। গুনগুন করে আপনিই। পদ্মফুলের মনে হয় গুনগুন করে। তবু কিছু বলতে পারে না। এই রকমই হয়।

অথচ প্রত্যেকের বুকের কাছেই একটা ইচ্ছে জমে উঠেছে। ইচ্ছেটা স্পষ্টই তাদের বুককে স্পর্শ করে আছে। চোখের চাওয়াতেও সেই ইচ্ছেটা ঝাপসা হয়ে আছে। পথ পাচ্ছে না, উজ্জ্বল হতে পারছে না। কিন্তু যারা এসে নতুন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তারা বুঝতে পারছে ইচ্ছেটা চোখ থেকে বুকে নেমে নেমে আসছে, তবু চোখের আয়তন খোলাই আছে, পোড়ো দরজার মতো। তারপর অবশ হয়ে যাচ্ছে, অবশ হয়ে ভাসছে। এক একটা ঢেউয়ের সঙ্গে উঁচু হচ্ছে আর নিচু হচ্ছে। তবু এ ঢেউ-ই। ঢেউটা স্রোত নয়, চলে না, এগিয়ে যায় না, শুধু উঁচু হয় আর নিচু হয়।

সামনেই ঘাসপাতানো বাগানের ভেতর মস্ত মাথা জলের ট্রাঙ্কটা খুউব উঁচু। লোহার লাল রেলিং চারপাশে হাত ধরাধরি করে ঘিরে আছে। তারই ধার ঘেঁষে মানুষগুলো থুপ্ হয়ে আছে। ট্যাঙ্কের মাথায় বেলাশেষের জলধোয়া রোদ চিকচিক করছে। না, ওখানেও কিছু নেই। আর ওখান থেকেই একটা সুতো ঝুলছিল টানটান। সুতোটা কেঁপে কেঁপে নড়ল।

একটা ঢেউ লাগল। ঢেউয়ে মানুষগুলো নড়ে উঠল, একটু উঁচু হল। আবার স্তরে স্তরে নিচু হল, তারপর স্থির। সুতোটা ছিঁড়ল না। অনেক জল ভিজিয়েছে সুতোটাকে, তবু পচে নি। কবেকার কোন্ ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়া সুতো। সুতোটা ঘুড়ির ছিল, এখন পাখিটার, পায়রাটার। অথবা এখন পায়রাটাই সুতোর। কিংবা এই মানুষগুলোই। মানুষগুলো যেন একটা টিনটিনে সুতোয় ঝুলছে। সুতোর মুঠোয় বাঁধা পড়ে গেছে। কেউ এড়াতে পারছে না। থুপ্ হয়ে ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে।

এরা যেন কোথায় উঠে এসেছে। সিঁড়িটা নির্জীব হলেও উঠে এসেছে। আকাশে কাজল-লাগা থলো থলো মেঘ ভাসছিল। ভাসছিল আর নিজের পথে এগোচ্ছিল। তারা এবার ঘুরছে। তখন পেছন দিকে ট্রামের তার কাঁপিয়ে একদলা-শব্দ ঘষতে ঘষতে চলে গেল। চারপাশের হাওয়াটা কিছুক্ষণ ভোঁতা হয়ে রইল। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে পুষ্টু হয়ে এল, নিথর হয়ে দাঁড়াল।

ওখানে তখন বোঝা যায় অথৈ ভাবনার জল। প্রথমে কোমর পর্যন্ত ছিল। তারপর ক্রমশ বাড়ল আর একটু একটু করে থিতিয়ে থিতিয়ে জলের সামিল হল। তাদের পায়ের, কোমরের, বুকের, শেষে হাত আর কাঁধের জোর হালকা হয়ে গেল। জলের তলায় ওজন হারিয়ে হালকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরকে হারিয়ে ভাসছে। ইচ্ছেটুকু মাঝে মাঝে কারো চোখে ধাতব হয়ে উঠছে, কিন্তু ধাতুর মতোই স্থির হয়ে থাকছে। তারপর আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। বুকের কাছ বরাবর নেমে আসছে।

একবার যেন সুতোটা হাওয়ায় টনটনে হয়ে উঠল। অনেক চোখের ঔৎসুক্য উঁচু হয়ে উঠল। সুতোটা যখন হাওয়ার টানে হেলে পড়ল—তখন অনেকগুলো ভাবনা সোজা হয়ে দাঁড়াল,—'হাওয়াটা আর একটু জোর হলেই হয়।' জোর হতে হয়তো পারত, কিন্তু হল না। হল না বলেই সকলের নিশ্বাস পড়ল, বিস্তীর্ণ নিশ্বাস। বুকগুলো নিচু হয়ে গেল। তবু সে আশা বিশ্বাসকে চোখের সঙ্গে ধরা আছে, ধরে রেখেছে নির্লিপ্ততায়—'সুতোটা ছিঁড়বেই আর পায়রাটা উড়বেই।' তবু কঠিন, স্থির টানটান সুতোটা ছিঁড়ছে না।

সিনেমা-ভাঙ্গা লোকগুলো গলগল করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে দেখল, জলের ট্যাঙ্কের মাথায় উজ্জ্বল রোদের দাগটা আর নেই। ট্যাঙ্কের

মাথা ছাড়িয়ে চাঁদিয়াল টুপিয়াল ময়ূরকণ্ঠী ঘুড়ি উড়ছে। উড়ছে আর এদিকে ওদিকে এঁকেবেঁকে লাট খাচ্ছে। মাথায় থলো থলো মেঘ ঘুরছে। সিনেমা-ভাঙ্গা লোকেরা অনেকেই দেখল অথবা দেখতে না পেয়ে নিজের পথেই চলে গেল। কেউ কেউ রাস্তা পেরিয়ে এল। অনেকখানি ইচ্ছাকে সাঁতরে সাঁতরে এল। এদিকে ওদিকে অনেক চোখমুখ দেখতে দেখতে সুতোটা নজরে পড়ল। যখন দেখতে পেল আর সুতোটাকে চিনতে পারল তখন সুতোয় জড়িয়ে গেল। সবার সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে বিছিয়ে গেল।

মাথা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চোখ এগিয়ে দেখল কেউ কেউ, ট্যাঙ্কের পাহারাদার কাকে যেন কী নিষেধ করল। 'নিষেধ? কেন? নিয়মের?'

যাকে নিষেধ করল সে যেন সবার থেকে মাথায় উঁচু হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে রইল। কিন্তু তার চেয়েও উঁচু আর শক্ত হয়ে খাড়া রইল ট্যাঙ্ক থেকে নেমে আসা পাইপগুলো। হয়তো তখন অনেক মনে নির্জীব জলটা টুকরো টুকরো হল। কেউ কেউ অনেক লোকের পাশাপাশি নিজের দাঁড়িয়ে থাকাকে ভাবতে পারল আর চোখের দৃষ্টি মানুষটাকেই উজ্জ্বল করে রাখল। তখন তাদের ইচ্ছেটা বুকে গভীর করে চাপ দিল, বুকগুলো আরও একটু পুষ্ট হল।

পায়রাটা দুলে উঠতেই সুতোটা কাঁপল। অনেকগুলো চোখ কেঁপে উঠল, মাথাগুলো একটু সামনে ঝুঁকে খাড়া হয়ে কী যেন চাইল। মুখে চোয়ালে যন্ত্রণার দাগ পড়তে পড়তে তবু ওরা জানে—এই রকমই হয়। যদিও পায়রার চোখটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না তবু ওরা ভেবে নিতে পারছে পায়রার চোখে ফুটে-ওঠা যন্ত্রণাটা কঠিন হয়ে আছে, টানটান হয়ে আছে। ওর বুকের নরম ধুকপুকটাও ভেবে নেওয়া যায়।

কেউ কেউ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে যেন অন্য কিছু ভাবতে চায়। অন্যকিছু ভাবতে চেয়ে নিজের মনে ফিসফিস করে—'তারা তো এল না!' তখন জানা গেল 'আগুন-নেভা'-র লোকেরা আসবে না।

আসবে না? অথচ তারাই যে আসে? নিয়ম!

তারা আসবে না আর ভাববেও না।

কী আশ্চর্য!

তবু লোকগুলো বুঝতে পারল, এক্ষেত্রে আর এক নিয়ম সময়ের মূল্য সোনা। মাথা নিচু করে করে নিজের নিজের বিশ্বাসকে দেখতে পেল বুকে।

ওরা যেন আগেই জানত, এই রকমই হবে। পাশাপাশি অনেক চোখ সরু হয়ে আসে তখন। সরু হয়ে আসে আর একটা দিকের দিকে নির্দিষ্ট হতে চায়।

আকাশের মেঘগুলো জোড়া লেগে লেগে ঘন হয়ে আসছে, কালো হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে মাটির দিকে, ট্যাঙ্কের মাথায়, এবং গাছপালা বাড়িঘর কার্নিশের ওপর। করাতের গুঁড়োর মতো বিষ্টি পড়তে লাগল ফিনফিন করে। মানুষগুলো একটু নড়ল, ছাতা খুলল, পা পাল্টে দাঁড়াল। একজন তার সঙ্গিনীকে ছাতার তলায় ডেকে নিল, টেনে নিল। মাথা, চুল, রঙ্গীন রিবন্ নিজের কাছাকাছি এনে ছাতায় ঢেকে রাখল। ছাতার তলায় পাশাপাশি আর খুব কাছাকাছি দুটো শরীর সরে এল। তারপর রাস্তার ওপর দিয়ে সরে যেতে লাগল। সরে যেতে যেতে বিষ্টির ভেতরে ঝাপসা হয়ে এল।

আর, এখানে মানুষগুলো একটু গুটিয়ে গেল। অল্প কটি ছাতার তলায় তলায় কাছাকাছি হল। সবাই একটি ইচ্ছার ভেতরে যেন নিবিড় হয়ে এল, নিবিড় হয়ে যাচ্ছে ; আর একটু বেড়ে ওঠবার ভাবনায় নিবিষ্ট।

বিষ্টি পাওয়া আকাশের জমাট কালো মেঘটা ফাঁক হয়ে যেতে যেতে বিষ্টিকে সরিয়ে দিতে লাগল শহরের অন্য দিকে। কিংবা বিষ্টিটা সরে যেতে লাগল শহর ছাড়িয়ে কোনো অন্য দিকে। ভিজে জলপাতাগুলো, জলো ভেজা চিহ্নগুলো চিকচিক করছে। আকাশের কোথা থেকে একটিপ জলো জলো রোদ আবার ট্যাঙ্কের মাথার ওপর বসল। হয়তো একটু পরেই আকাশের ভেতর উড়ে যাবে। তখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না একটিপ রোদ্দুরও। হয়তো ওদের চোখ তুলে চেয়ে থাকা দৃষ্টি ঠিক এদিক থেকে ভাবছিল না। খুঁজে পাওয়া যাবে না যখন একটিপ মায়া-করা রোদ্দুরও তখন যেন সব মানুষগুলোই অন্যরকম হয়ে যাবে। বদলে যাবে। তাই, ওরা চাচ্ছিল ওই একটিপ হরিণ-রোদ্দুর যেন না পালায়। বুঝি এমন একটা ভাবনার ভেতরেই তারা স্থির হতে চাচ্ছিল আর চারপাশের জলো হাওয়া একটু একটু করে বুক ভরে নিচ্ছিল। একটিপ রোদের শরীর থেকে বুকের আয়ুকে চিনে নিচ্ছিল। যেন আর একটু রোদ হলে মানুষগুলো আরও একটু আয়ুষ্মান হত। রোদ্দুরটা ওদের মনে সোনার মতো হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে অনেকগুলো চোখ, চোখের দৃষ্টি খাড়া

উঠল ট্যাঙ্কের ওপাশের উদ্দেশ্যে। পেছন পেছন আরও অনেক চোখের দৃষ্টি ভার বুক। আকাঙ্ক্ষা উঁচু হয়ে উঠল আর ঝুঁকে পড়ল, লাল রেলিংটা নড়বড় করে উঠতে কঁচ্কঁচ্ শব্দ হল। গোলা পায়রা কটা দূর থেকে ঘুরপাক খেয়ে ক্রমে আসছিল। নেমে আসতে লাগল।

কটা পায়রা ? একটা, দুটো, তিনটে…

পাখনাগুলো আলো নিয়ে কাঁপছে আর টানটান সুতোটার দিকে নেমে আসছে।

তখন সবার মন যেন একটি সূঁচের ডগায় একটি আকাঙ্ক্ষার বিন্দু। সবার দৃষ্টির সঙ্গে পায়রাকটি ঘুরতে লাগল চারপাশে, টানটান সুতোটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চারপাশে।

তখন যেন কাঁপছিল সূঁচের ডগায় একবিন্দু আকাঙ্ক্ষা।

যন্ত্রণার পায়রাটা উড়তে চেয়ে এবার অনেকটা নড়ল আর দুলতে লাগল। এবার সবাই দেখতে পেল, পায়রাটার পা নয়, শঙ্খমাজা সাদা পাখনাটাই জড়িয়ে গেছে। জড়িয়ে গুটিয়ে আছে সুতোয়। আকাশের গা থেকে আলাদা, খণ্ড হয়ে গুটিয়ে আছে সুতোর মুঠোয়। ওখানে অনেকখানি বধির শূন্যতা কঠিন হয়ে আছে।

গোলা পায়রার পাখনাকটা পতপত শব্দ করছিল। যেন শূন্যের ওপর দাগ কাটছিল।

হয়তো তখন অনেকগুলো মুখের পর্দা নড়ছিল আর সমস্ত শরীর থেকে শব্দগুলো বুকের কাছে উদ্বেগে জমা হচ্ছিল। ধারালো হচ্ছিল। চোয়ালের দিকে ঠেলে গুঁজে উঠতে চাচ্ছিল। যেন কিছুটা সময়ের জন্যে সমস্ত শরীর নিয়ে তারা ভেসে উঠল। ভেসে উঠে জানতে পারছিল তাদের হাঁটুতে, হাতের কব্জিতে, কাঁধে উত্তাপ আর শক্তির বিদ্যুৎ কাঁপছে। কাঁপছে আর এগিয়ে উঠতে চাচ্ছে সুতোটার নাগাল পর্যন্ত। গোলা পায়রাকটি ঘুরছে, পতপত করে পাক দিচ্ছে চারপাশে আর তাদের পাখনায় এরা শক্তি জোগান দিতে চাচ্ছে। জোরে…আরও জোরে…, তাদের বিশ্বাস যেন উৎসুক হয়ে উঠে বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে জানান দিচ্ছে—'সুতোটা এবার ছিঁড়বেই, পায়রাটা উড়বেই।'

যন্ত্রণার দাগগুলো মুছে মুছে গিয়ে মুখগুলো তেলতেল হয়ে উঠেছে, চোখগুলো চকচক করছে। সময় যেন চূড়ায় উঠে ছোট্ট দেখাচ্ছে।

পরিশ্রমের হাওয়া তাদের চারপাশে সরু হয়ে এসেছে, লিকলিক করছে। সমস্ত নজরকে এক জায়গায় জড়ো করে যেন ওরা বধির হয়ে যাচ্ছে। শুধু নজরের ভেতরেই তারা তখন বেঁচে ছিল, বেঁচে থাকার উত্তাপ তখন তামাটে হয়ে ঝুলছিল তাবৎ জায়গাটার ওপর।

ওদের সমস্ত উচ্চতাকে টেনে ধরবার জন্যে অথবা মাটির দিকে টানবার জন্যে পাশেই একটা কুকুর 'আঁ-আঁউ' করে শব্দ করল। তার রোগা জিরজিরে শরীর আর পিঠের হাড়গুলো গোল করে দেখাল একবার। তারপর পা দুটো সামনে বাড়িয়ে মাটির কাছে মুখ গোঁজবার মতো হল, কানদুটোর ঝাঁকি দিয়ে শব্দ করল—ফট্‌ফট্, ফট্‌ফট্…।

ওরা যেন শুনতে পেল শব্দটা, নিরিখ নামিয়ে নিল। দেখল, কুকুরটা চলে যাচ্ছে। চলে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাল। তাকাচ্ছে। লেজটা একবার বেঁকিয়ে লাফ দিল, লাফ দিয়ে রাস্তার আড়াল হয়ে গেল। ওরা তখনও সম্ভবত কুকুরটার চলে যাওয়া ভাবছিল, কিংবা ছবির মতো ছাপ পড়ছিল মনে, চামড়ার ওপর ফুটে-ওঠা ছিপছিপে হাড় কখানা কি ভাবে এঁকেবেঁকে কুকুরটাকে বয়ে নিয়ে গেল। এই ছবি দিয়ে শ্লথ আঙ্গুলে হলুদ রঙের মনকে নাড়তে নাড়তে চমকে উঠল। ট্রামের চাকা হাওয়ায় শান্ দিয়ে গেল। হয়তো ট্রামের চাকার শব্দের হাহাকার, কিংবা হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে তারা সচেতন হল। কাজ ভুলে-যাওয়া মনের মতো সজাগ হল। চোখগুলো হতাশ হয়ে খুঁজতে লাগল আর দৃষ্টি খোসার মতো নিষ্প্রাণ হয়ে চুপ করে গেল।

গোলা পায়রাকটি উঁচু বাড়িটার এরিয়ালের ওপর বিন্দুর মতো ছোট্ট হয়ে এল। মিলিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেল। শুধু চিলের কানিশ আর এরিয়ালটা আলোর ভেতরে হাত প্রসারিত করে বিস্মিত হয়ে রইল। চাঁদিয়াল, টুপিয়াল ঘুড়িকটা অকারণ আকাশের দিকে টিপ করে আছে, টিপ করে রইল, কিংবা চেরা চেরা রং-ফালি মেঘের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে···অবাক হয়ে যাচ্ছে।

আর সেইজন্যেই অনেকগুলো চোখমুখ অনুতাপে সমতল হয়ে আসতে লাগল। ভিজে ভিজে জলের ট্যাঙ্কের মাথাটা চুপচাপ আর শক্ত মনে হতে লাগল। হয়তো সেইজন্যেই সেই একটিপ কোমল রোদ্দুর ছোট্ট হয়ে এসেছে। উড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে পাখনা গুটিয়ে নিরিখ করছে। আর একটু রোদ্দুর যদি—আহ্, আয়ু—আরও একটু বাঁচবার কথা ওরা ভাবত। হয়তো

ভাবতে ভাবতে পা পালটে দাঁড়াবার ইচ্ছে হল, আর অন্যরকম ভাবনায়, মানুষের সঙ্গে পায়রার কোমল মিলকে কিংবা পায়রার মতো চিৎকার না করতে পারার অসহায়তার মিলকে মেনে নিচ্ছিল। হয়তো পায়রাটার উড়ে-যাওয়া চিত্রের কল্পনায় কোন্ কার্নিশে, দালানের থামে অথবা গেরস্তবাড়ির বারান্দায় ঝুলন্ত চুপড়ির বাসায়, বা কোথায় আশ্রয় নেবে পাখিটা—এমন করে ভাবছিল। ইচ্ছেটাকে চোখের ওপর দিনান্তের মসৃন আদরের মতো তুলে আনছিল, অনুভূতি দিয়ে বুকে বুকে খাড়া করে রাখছিল।

পায়রাটা তার একটি মুক্তডানা সবাইকে দেখিয়ে নাড়া দিল, যেন ইচ্ছে করেই। একটা পালক খসে এল, মাটিকে চিনতে চেয়ে নামতে লাগল, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে, ধীরে ধীরে, ঘুরে ঘুরে। ওরা দেখতে পেল আর দেখার জন্যে তাকিয়ে তাকিয়ে ইস্পাত-দৃষ্টি দিয়ে আঁচড়াতে লাগল জলের ট্যাঙ্কের মোটা মোটা পাইপের গা। একটু আগে যে পাইপ বেয়ে উঠতে চেয়েছিল, উঠতে চেয়ে মুখ উঁচু করে উজ্জ্বল হয়েছিল, সে মাথা নিচু করল। তারপর পেছনে সরে আসা তার খুবই স্বাভাবিক, আর পকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়ানো যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো কুঁজো হয়ে আসা।

অনেকের ওখানে মনে পড়েছিল—"আহা 'আগুন-নেভানোরা' যদি আসত!" আর যদিও আকণ্ঠ চুপচাপে নুইয়ে আসাকে মেনে নিচ্ছিল, কিন্তু তবুও কোনো সম্ভাবনার ঢেউকে আশা করবার চেষ্টা করছিল—হয়তো হঠাৎ কোনোভাবে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মতো হবে ওরা। কিন্তু হাতের কাঁধের বিদ্যুৎ হারিয়ে ওরা যেন চোখ মেলে মাটির সঙ্গে সমান হয়ে রইল। টুকটাক শব্দের আর কথার আলাদা আলাদা ঘর তৈরি হয়ে ওরা যেন এক অলস অনুভূতিতে দূরের মতো ঝাপসা।

মাথার ওপরে ঢলঢলে একখানা মেঘ—থেমে থেমে এগিয়ে আসাকে কেউ লক্ষ্য করে নি। রং-ফালি চেরা চেরা মেঘগুলির বুক ছুঁয়ে ঢলঢলে মেঘখানা ভালোবাসা হতে চাইছে। কিন্তু শুধু লক্ষ্য করেছিল ওরা জলের ট্যাঙ্কের রোদ্দুর-টিপ ম্লান হয়ে কাঁপল, তারপর আর দেখা গেল না। কোথায় খুঁজবে? হয়তো আকাশে মেঘের আগুনে-আঁচ রংয়ের ভেতরে হারিয়ে গেল। মিশে গেল।

কে যেন বৃত্তের বাইরে আলাদা হয়ে দাঁড়াল, থুপ্ হয়ে-থাকা মানুষগুলি থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে আপন মনে মাথা নাড়তে লাগল, "না, না।

নাঃ।" যেন পায়রার নরম ধুক্‌পুক্ বুকটা পরিষ্কার মনে হল তার, তারপর আর একবার পেছনে তাকিয়ে যখন রাস্তা পেরিয়ে গেল তখন আর তাকে চেনা গেল না।

আর, যে ছেলেটা ট্যাঙ্কের ওপাশে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, সে যখন লাটাইটা উঁচু করে ধরে মানুষগুলোকে বেড় দিয়ে ঘুরে আসছিল, ঘুরে এপাশে আসছিল, চাঁদিয়াল ঘুড়িটা তারই পেছন পেছন মাথায় মাথায় এগিয়ে আসছিল, তখন এদের যন্ত্রণার পরিচয় দিয়ে ছেলেটার মুখটাকে চেনা যাচ্ছিল না। যেন কোনো স্বচ্ছন্দ ধারণা তার চঞ্চল চোখের ধারে, মুখের উঁচুনিচুর ভেতরে ওঠানামা করছিল। আরও যখন তার দুহাতের মুঠোর ভেতরে লাটাইটা তরতর করে ঘুরতে শুরু করল, লাটাইটার ক্রর্‌-র্‌-র্‌-র্ করে সুতো ছেড়ে ঘোরার ওপরে মনটা একাগ্র করে ধরে রাখল; তখন তার ধাবমান সুতো যেন একটি নির্ভুল বিশ্বাস, ঝুলন্ত সুতোটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চমকে দিতে লাগল।

একটি বিশ্বাসী মনের ভেতর সে ছবির মতো ভাবতে পারছিল, পরপর ভেবে নিতে পারছিল, হঠাৎ ঝুলন্ত সুতো টান হয়ে থাকতে থাকতে টিং করে লাফিয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রাটা ঝুলে পড়বার মতো হতে হতে টাল্ খেয়ে যাবে। টাল্ খেয়ে ডানা ঝাপটে উঠেই হাওয়ার খুরে খুব হালকা আর ফুর্‌ফুরে খুসির মতো পতপত শব্দ—ডানার…। শব্দের ভেতরে অনেকগুলো মানুষ জেগে ওঠার সাড়া পাওয়া যাবে—সাড়া উঠল—সাড়া পাওয়া যাচ্ছে…। অনেকগুলো একপেশে মুখ পুবের দিক থেকে উত্তরে ঘুরল, উত্তরমুখী তাকাল, তারপর পশ্চিমের দিকে উন্মুখ হল। যেখানে ঢলঢলে মেঘখানা পোড়া মাটির মতো রং হয়ে সাদা দুটি ডানাকে সুন্দর করে এঁকে তুলল। সহরের গায়ের ওপর কার্নিশের চূড়ায় চূড়ায় জোরে জোরে আঙুল দেখিয়ে চোখে চোখে তারা অন্যরকম উজ্জ্বল হয়ে গেল। আকাশে তখন মেঘের রং আগুনে-আঁচ আর মোলায়েম দুটি শঙ্খ ডানা, মূঢ় মাটির থেকে ভালোলাগা উঁচু উঁচু ডালপালা নড়ছিল বারবার।

পায়রাটা যখন আঙুল তুলে দেখতে পাওয়ার সীমানা থেকে হারিয়ে গেল তখন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল শহরের অলিগলির খোঁজে। কত গেরস্থ ঘরে, চিলেছাতে আর কার্নিশে, হয়তো পলাতকা ভালোবাসা পায়রার জন্যে!

পার্সের কবিতা প্রসঙ্গে

জ্যোতির্ময় বসু

র‍্যাঁবো ও মালার্মের নির্দেশিত পথে ফরাসী কবিতা পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতার খোঁজে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, সংগীতের সুর হতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ; তখন জিদ মালার্মের শ্বাসরোধকারী শুদ্ধতার বাইরে এলেন। পায়ের নিচের ভিজে ঘাস মুক্তি দিয়েছিল তাঁকে। বার হয়ে এলেন ক্লদেল। শব্দের যাদুমন্ত্রের ওপর ভরসা না রেখে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী বন্দনা করলেন। "Just at the moment when poetry might have been an abnegation or a defeat, it was redefined by claudel as a conquest of the universe." (Wallace Fowlie) র‍্যাঁবো ও মালার্মের সৃষ্ট কবিতার সংকট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সাঁ ঝন পার্স ক্লদেলের মতোই পৃথিবীর দিকে এলেন বিজয়ীর দীপ্তিতে। তাই শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কবিতার সন্ধানের দিক থেকেও এঁরা সমগোত্রীয়।

আরাগঁ বলেছিলেন প্রত্যেক সার্থক কবিতা কবিতার নতুন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা। যেহেতু কবিতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। পার্সের কবিতা প্রসঙ্গে এই উক্তি দিক-দিশারী। কারণ তাঁর কবিতা নতুন দিগন্ত। এবং খণ্ডকাল থেকে অনন্তকালে উত্তরণের সাধনা ও সিদ্ধি। চেতনাই তাঁর পরিচালক। তাই পৃথিবীর প্রতি মমতা সর্বগ্রাসী। তিনি জীবনকে জয় করতে চান, অধিকার করতে চান। তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও কল্পনা-প্রতিভা অনন্তের দিকে প্রসারিত। গতি কবিতার প্রাণ। সচল ও প্রবহমানতায় কিন্তু কখনো সম্পর্কচ্যুত নয়, প্রতিনিয়ত নতুন রেখাচিত্রে তিনি আবদ্ধ। ক্লদেল আবদ্ধ হয়েছেন খ্রীষ্টতত্ত্বের মর্মকথায়। তাই ক্লদেলের কবিতায় পৃথিবীর রূপ বদলে যায়। কিন্তু পার্সের কবিতা মানবকেন্দ্রিক। তাই তাঁর কবিতার পৃথিবী আমাদের একান্ত পরিচিত, পুরাতন, নিত্য-নবীন ও সত্য। মানুষ এবং মানুষের প্রতি ইচ্ছার পিছনে তিনি কালাতীত সত্যের সঙ্কেত পান। তাঁর কবিতা বাস্তবতাকে অধিকার করার অনলস সংগ্রামে লিপ্ত। যেহেতু

বাস্তব নিরন্তর দ্বন্দ্বমুখর তাই তাঁর কবিতায় মানুষ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে একটি সত্তার সংকল্প হয়ে ওঠে। খণ্ডকালের পরিমাপে আমাদের সুখ ও দুঃখ নতুন সৌন্দর্যে স্থিতধী হয়। আর এই সৌন্দর্যের তপস্যায় কবি সমাজের দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকেন না। তিনি খণ্ড ও অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিধি পার হয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করেন। তখন আর হাহাকার থাকে না। মূল্যবান ও সার্থক অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে সেই ব্যক্তিসত্তা চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়।

এলঝ (Eloges) পার্সের প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই। প্রকাশ কাল ১৯১০ সাল। সমগ্র কবিতা শৈশবের স্তব। পার্সের জন্ম হয়েছিল (১৮৮৭) প্রবাল দ্বীপে—Guadaloupe-এ। এগারো বছর বয়সে পার্স প্রথম প্যারিসে আসেন। প্রবালদ্বীপের সবুজ বন্যতা, বন্দর ও সমুদ্র ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। এই স্মৃতি-চারণের মেদুরতায় শৈশব হয়ে ওঠে কবির আশ্রয়—তাঁর প্রেম। কোনো কোনো মতে কবিতার উৎস স্মৃতি। পার্সের স্মৃতিতে বেঁচে ছিল প্রবাল দ্বীপের সমুদ্র, সমুদ্রের জোয়ার ; বজ্র বিদ্যুৎ ঝড় আর আগ্নেয়গিরি। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। ১৯১৪ সালে কূটনৈতিক দপ্তরে কাজ নিয়ে ১৯১৭-য় গেলেন চীনে। ১৯২২ সালে প্রাচ্যদেশের বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি পান। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় আনাবাজ্ (Anabase)।

আনাবাজ্ আমাদের যুগের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এলিয়ট অনুবাদ করেন ১৯৩০ সালে। এই প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন যে পার্সের কবিতা বারবার পড়া দরকার এবং ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। এই কবিতায় শৈশবের প্রতি আকর্ষণ নেই। বরং কবিকে দেখা যায় বিজয়ীর বেশে। অস্ত্র ও অশ্বে সুসজ্জিত বীর বিদেশে আছেন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে। ভবিষ্যৎ নগর পরিকল্পনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির বা যোদ্ধারও অন্তর্ধান হল। আনাবাজ্ পার্সের শুধু মাত্র কল্পনা প্রতিভার জয় নয়, কবিতার বা জীবনের জয়। এতকালের একনিষ্ঠ অন্তর্লোক-সাধনার পর্ব শেষ করে কবি অন্তর্লোক ও বহির্লোকের সুসম সঙ্গতিতে দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকা নিয়েছেন। ব্যাপ্ত দৃষ্টি অভিষিক্ত করেছে জীবনের প্রতি স্তর। অতি সাধারণ তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয় থেকে উৎসারিত কবিতা মহত্ত্বের আভা পায়—"assembling on the waste of exile a poem born of nothing, a great poem made from nothing." কারণ, অতি তুচ্ছতাও অনন্যতার প্রসাদ-পুষ্ট। যেহেতু

"ইতিহাস তো একমাত্র আত্মার ইতিহাস, শান্তি তো একমাত্র আত্মার শান্তি।" এলঝ-এ যে আদিমতা ইতস্তত ছিল, আনাবাজ্-এ তা জীবনের মূলীভূত উপাদান। আঁদ্রে মার্লোর উপন্যাসের এক নায়ক বলেছিল, "age of fundamental is returning." পার্সের কবিতায় যেন তারই পূর্বাভাষ। বাতাস তুষার বৃষ্টি ও সমুদ্র কবিতার মন্ত্র। যে পৃথিবী চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ইন্দ্রিয়ের স্বপ্নময়তায় যা জড়িয়ে থাকে সেই মূলগত উপাদান শব্দের যাদুতে অবিনশ্বরতা পায়। তাই তিনি পৃথিবীকে দেখেন না, সৃষ্টি করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেন নিজেকেও। আনাবাজ্-এর রাজপুত্র স্বয়ং কবি। জীবনের বৈপরিত্য স্বীকার করে নেন। এই রাজপুত্র শক্তিধর কিন্তু নির্বাসিত। সে ঐশ্বর্যবান এবং দরিদ্র। কবিও তাই। তিনি নগ্ন, অখণ্ড ও সঞ্চারিত। তবু চূড়ান্ত প্রাপ্তি তাঁর নেই। কারণ চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে কিছু নেই। তাই শেষকালে থাকে নৈঃশব্দ্য···"the rest is silence"। এখানে কবির অসম্ভবের সাধনা। একদিকে তাঁকে প্রকাশিত হতে হচ্ছে স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে অন্যদিকে তাঁকেই আবার ব্যক্তিত্বের পরিধি অতিক্রম করে স্রষ্টার সিংহাসনে যেতে হবে। বস্তুত, র‍্যাঁবোর মতনই পার্স 'দিব্যতা'য় অভিভূত।

> "বার্লি ক্ষেতে মানুষ চলাফেরা করে। তীব্র গন্ধে আমি আচ্ছন্ন। জল-তরঙ্গ জাবালের চেয়েও পবিত্র। সুরে অন্য যুগের সঙ্কেত।··· নিরাভরণ বছরের দীর্ঘতম দিনে, উদ্ভিদে আচ্ছন্ন পৃথিবীকে আমি বন্দনা করি। জানি না, কোন্ শক্তি আমাকে ভর করেছে। বালির নিচে শব, প্রস্রাব, পৃথিবীর লবণাক্ততা। ছাখো, ছাখো, পাখিকে ধান দেওয়া হল। কিন্তু ওরা চিটের মতো পড়ে থাকল। মৃত্যুর দেহলিতে আমার আত্মা বিরাট গুঞ্জন নিয়ে চেয়ে আছে। ······কিন্তু রাজপুত্রকে স্থির হতে বল। আমাদের মাঝখানে বর্শার ফলকে অশ্বের করোটি।" কারণ, "আমরা তো চিরকাল এই হলুদ ভূমি, আমাদের আনন্দে থাকব না।" তাই "মুখের ওপর সেই বিরাট পাখি একবার ছায়া ফেলে সরে যাবে।" থাকবে শুধু মাত্র আকর্ষণ। থাকবে জীবনের আদিম উপাদান—সমুদ্র, সূর্য, বাতাস ও তুষার।

শব্দ কবিতায় ব্রহ্ম না হলেও মহার্ঘ। শব্দ দুই রকমের। এক, সাধারণ শব্দ। অভিধানে তার অর্থ পাওয়া যায়। সমাজ চলে তার জোরে। সে

ব্যবহারিক। আর এক শব্দ আছে—যা সঙ্গীত। কয়েকটি কথা গাঁথলে যা মন্ত্র হয়ে যায়। তার কোন স্থিরীকৃত অর্থ নেই অভিধানে। এই-ই কবিতার ভাষা। ব্যবহারিক ছকবাঁধা অর্থ থেকে বহু দূরের অস্পষ্টতার আভাষ এনে দেয়। এই ভাষা নিবিড় করে কথা বলার যাদুমন্ত্র। এই শব্দের পরিমণ্ডলের বাইরে শূন্যতা, বাতাস। স্থান কালের বাইরে মহাজাগতিক ব্যাপ্তি হল পার্সের চতুর্থ কবিতার বই 'ভাঁ' (Vents: ১৯৪৬)-এর বিষয়। এর মাঝখানে, যুদ্ধের সময়, নাগরিক অধিকার হারিয়ে তিনি চলে আসেন আমেরিকায় (১৯৪০) এবং তৃতীয় কবিতার বই 'একজিল্' (Exile) প্রকাশিত হয়। ভাঁ-এর কবিতায় পার্সের দক্ষতার অপূর্ব প্রকাশ। মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের বিষয় এই কবিতায় অঙ্গীকৃত। বরাবরই গদ্য তার বাহন। র‍্যাবো ক্লদেলের ঐতিহ্যপুষ্ট ফরাসী গদ্য কবিতা, পার্সের হাতে পৌরুষের দীপ্তি ও অনন্তের স্বপ্নময়তা পেয়েছে। মানুষের বিরাটত্বকে সাম্প্রতিক কালে অল্প কবি বোধহয় এমনভাবে উপলব্ধি করেছেন। এই বিস্তীর্ণতর পরিধিকে অঙ্গীকার করার বাসনা ছিল রেনেসাঁস যুগে। হুইটম্যানে আবার এসেছে সেই দিগন্ত-পিপাসা এবং শক্তির সুন্দর মত্ততা। তৃষ্ণার দিক থেকে পার্স হুইটম্যানের অনেক নিকটে। কিন্তু হুইটম্যানের পরে শিল্প সাধনা এবং মানুষের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ। তাই হুইটম্যানে যা কর্কশ ও স্পষ্ট, পার্সে তাই আরো গভীরতর সঙ্কেত আনে। কারণ পার্স মানুষের সমগ্র ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে চান। বিশ শতকে এই ব্যাপ্ত বিশ্ববোধ বিরল। তাই জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "St. John Perce. as the contemporary poet, does not borrow from the traditional forms of poetry, but from the words of language itself and from the sentiment of vertigo felt by the poet on the brink of space, in the midst of limitless winds." ক্লদেল ১৯৪৯ সালে পার্সের কবিতার আশ্চর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি প্রশংসায়ও অকুণ্ঠিত। বস্তুত ভাঁ-এর পর পার্স নতুন মর্যাদায় দীপ্ত এবং সাম্প্রতিক কালের মহৎ কবি হিসাবে স্বীকৃত।

ভাঁ-এ কবির আবির্ভাব আবিষ্কারক ও জ্যোতিষী হিসাবে। এখানে কবি স্বতই গতির মধ্যে। তাঁর কোন বিশ্রাম নেই। বাতাসের গতির সঙ্গে মেশা শব্দের গতি। সেই আবিষ্কারক যাত্রা শুরু করেছেন তাঁর লক্ষ্যের

দিকে। প্রতি পদে তাঁর প্রশ্ন ও সংশয় এবং সংশয়ের মুক্তি। কারণ তাঁর প্রতীক বাতাস—যা মানুষকে প্রাণদান করে, যার গতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে না সচেতন জ্ঞানের প্রয়াস। এখানেও কবির বিশ্বাস মানুষ তার স্বাভাবিক দেশ পায় নি। সে এখনো নির্বাসিত। সে সত্তার অদ্বৈত অর্জনে অসমর্থ। একদিকে সে সমগ্র মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে সে আবার মানুষের সমাজের গভীরে প্রোথিত। এই সঙ্কটে প্রতীকবাদীরা আত্মার নির্জনে যেতে উন্মুখ। সুর-রিয়ালিস্টরা এই সঙ্কটে হিংস্র, ভাঙার জন্য অতি ব্যগ্র। এই দুই পন্থার কোনোটাই পার্সের কাছে গ্রহণীয় নয়। তিনি কখনও কবি হিসাবে নিজের ভূমিকা বর্জন করতে পারেন না। কবি সৃষ্টিকর্তা, কর্মী। তাই পার্স কখনো নিষ্ক্রিয় নন। তিনি গতির মধ্যে মানুষের বৈষম্যকে ঘুচিয়ে ঐক্যের নিবিড়তা অর্জন করতে চান।

পার্সের সর্বশেষ কবিতা 'আম্যার' (Amers)। আম্যার সমুদ্রবন্দনা। এমনভাবে সমুদ্রবন্দনা আগে আর হয় নি। সমুদ্রের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক খুব গভীর। সৃষ্টির আদিতে ছিল জল। "And the earth was without form and void; and the darkness was upon the fall of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the water." Book of Genesis-এ এই হচ্ছে সৃষ্টি-উৎস। গ্রীক পুরাণেও পাওয়া যায় সমুদ্রের গভীরে রাত্রির-ডিমের ভিতর থেকে Eros-এর উৎপত্তি। হিন্দু-পুরাণে সৃষ্টির আদির সঙ্গে সমুদ্র জড়িত। সমুদ্র তাই জীবনের প্রতীক। আদিম ও অবিভাজ্য প্রবহমানতা, যার মধ্য থেকে শৃঙ্খলা ও সুষমা উঠে আসে লক্ষ্মীর মতো, ভেনাসের মতো। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডির যুগে সমুদ্র এসেছে বিরোধের দৃশ্যপট হিসাবে। কিন্তু টেমপেস্টে এই সমুদ্র স্বতন্ত্র। অডেনের কথায় এই সমুদ্র "place of purgatorial suffering." রোমানটিক যুগে সমুদ্র জীবনের লক্ষ্য। সমুদ্রযাত্রাই মানুষের একমাত্র কাম্য। বায়রন কিংবা বোদ্‌লেয়রের মতো সাম্প্রতিক এলিয়টও মানুষকে "voyagers" বলে অভিহিত করেছেন। পার্সের কবিতায়ও সমুদ্র প্রাণ-দাত্রী।

> "নাটকের পাথুরে সিঁড়ির ওপর সমুদ্র উঠে আসে। সঙ্গে তার রাজপুত্র, কোটাল, অমাত্য। ধাতু ও আড়ম্বরে বিভূষিত তারা। তার অভিনেতার চোখ বিস্ফারিত। তার সাধক শৃঙ্খলিত। তার

যাদুকরী কাঠের সিঁড়িতে, মুখে কৃষ্ণরেণু। বন্দনার চাতড়ের পাশে পাশে কুমারীর দল।

সঙ্গে তার মেষ-পালক, জলদস্যু, শিশু রাজার দাই-মা। সঙ্গে তার নির্বাসিত যাযাবর আর দীর্ঘ ও নীরব বিধবা, ভস্মবিভূতিময়। সঙ্গে তার সিংহাসন-উচ্ছেদকারী ও উপনিবেশের পত্তনিদার। তার সদাগর টিনের খনিতে। মহিষের পিঠে চড়ে ধান্ ক্ষেতে সাধকের দল।"

যেহেতু পার্সের কবিতা ইতিহাস এবং সময়ের মধ্যে জন্মলাভ করেও ইতিহাস ও সময়ের বাইরে আসতে চায়, সেহেতু বাতাস ও সমুদ্র তার প্রতীক। কারণ এরা ইতিহাসের গণ্ডীর বাইরে। ১৯৫৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী একটি চিঠিতে পার্স নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন: "My work...has always evolve beyond space and time...it intends to avoid any historical or geographical reference,...it intends to avoid any personal incident." আর এই ব্যক্তি ও সময়ের গণ্ডীর বাইরে আসতে প্রয়োজন শক্তি ও চেতনার। তাই শক্তি ও চেতনা তাঁর পুরোহিত। মবি ডিকে পাওয়া যায় অকূল সমুদ্রের মধ্যে তাহাতি দ্বীপ। অর্ধ-পরিচিত জীবনের বিভীষিকার মাঝখানে সেই দ্বীপ। সেখানে শান্তি ও আনন্দ। পার্সও তেমনি সেই দ্বীপের আভাষ পান। সেখানেই শক্তি। "শক্তি, রাত্রির অন্ধকার পথে তুমি গান গাও। ভোরের বিশুদ্ধ সীমান্তে জানো কি স্বপ্ন আছে—যাতে আমাদের জন্মগত অধিকার ?"

বোদ্‌লের নৈঃশব্দ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। র‍্যাঁবোর জীবনে সেই নৈঃশব্দ্য অভিজ্ঞতার চূড়া। মালার্মে জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে. ধ্যানমগ্ন। বাস্তব ও সৃষ্টি থেকে কবিতা সরে এসেছে বহুদূর। ক্লদেলে যার শুরু পার্সে তার পরিণতি। কবিতা এবং কর্মকে এক করে এঁরা পৃথিবী সৃষ্টি করতে গিয়ে সৃষ্টি করেন নিজেকেও। এবং সেই সঙ্গে জীবনকে নতুন মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু ক্লদেলে যা বিমূর্ত, পার্সে তা মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বস্তু কখনো নির্যাস বা চেতনা হয়ে যায় না। বরং বস্তু নতুন চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে পার্সের নিজের উক্তি বিশেষ মূল্যবান: "Nothing seems to me, moreover, more surprising than to explain a "poet" always by "culture". Personally I am greatly astonished to

see favourable critics apprise the poem as a crystallisation, since Poerty to me is movement above all—in its birth as well as into its growth and final release. The very philosophy of the "poet" seems to me the ability to recall to himself, fundamentally, the old elementry "Rheism" of ancient thought —the like that of our pre-Socraties in the west···Hence for the "poet" the importance of sea in everything."

এ বছর সুইডিস আকাদেমি পার্সকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বহু আগে থেকেই পার্স ফরাসী কবিতায় বিশেষ সম্মানের অধিকারী। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁকে আবিষ্কার করতে পারি নি।

জনকল্যাণ ও সোভিয়েত অর্থনীতির উদ্দেশ্য

বিমল চক্রবর্তী

সোভিয়েত অর্থনীতির প্রগতি এবং জনকল্যাণমূলক দিকটি কতদূর অগ্রসর হয়েছে, সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থ দূতস্থানের বার্তাবিভাগ পরিবেশিত দুটি প্রবন্ধ থেকে তার উদাহরণ পাওয়া গেছে। এই প্রবন্ধে সোভিয়েত অর্থনীতি প্রসঙ্গে যে সব তথ্য ব্যবহার করা হবে তা এই দুটি প্রবন্ধ থেকেই নেওয়া। জনকল্যাণমূলক কাজে কি করে অর্থনীতিকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা মাত্র দুটি দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে। প্রথম বিভাগে দেখানো হবে সোভিয়েত পরিকল্পনায় অর্থ-সংস্থানের প্রকৃতি ও তার পরিবর্তন এবং দ্বিতীয় বিভাগে দেখানো হবে সোভিয়েতের জাতীয় আয় ও তার বণ্টন।

সোভিয়েত পরিকল্পনায় অর্থ-সংস্থানের প্রকৃতি[১]

একদা অনুন্নত এবং ব্রিটেন, জার্মেনী, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক অনগ্রসর এবং বেশ কিছু পরিমাণে নির্ভর, সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের পর থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গত তিরিশ দশকের শেষের দিকেই ইউরোপীয় দেশগুলিকে এই দেশ শিল্পোৎপাদনে অতিক্রম করে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরই তার স্থান করে নেয়।

বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত শিল্পোৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই দেশ উৎপন্ন করে এবং আগামী দশ বৎসরের ভিতর কি শিল্পোৎপাদনে, কি মাথা পিছু ভোগে এই দেশ সমস্ত দেশগুলির তুলনায় অগ্রগামী হয়ে উঠবে। এই বৈপ্লবিক অগ্রগতি সম্ভব হবে, কারণ সোভিয়েত দেশের অগ্রগতির হার অন্যান্য সমস্ত দেশের অগ্রগতির হার থেকে অনেক বেশি (গত পনের বৎসরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েত দেশের শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি ৬.৩ গুণ বেশি)।

এই অগ্রগতির প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে গত তেতাল্লিশ

১। N. Kirichenko—Financing of National Economy in the U.S.S.R.

বৎসরের ভিতর সোভিয়েত দেশে বার বৎসর এবং আরও দশ বৎসর যথাক্রমে ব্যয়িত হয়েছে মহাযুদ্ধে ও যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনায়। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য অগ্রগতি সম্ভব হল কি করে? এর উত্তর দিয়েছেন এন, কিরিচেঙ্কো তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধে। এই অগ্রগতির মূলে হল সোভিয়েত জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে তাঁদের কর্মযজ্ঞ তাঁদেরই অর্থাৎ সমাজতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠার জন্য; কারণ বিপ্লবের আগেও রাশিয়ায় খনিজ সম্পদ, কৃষিক্ষেত্র এবং কর্মক্ষম জনসাধারণ ছিল; কিন্তু একমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের জন্যই ১৯১৭ সালের পর রাশিয়ায় এক গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে।

বিপ্লবের আগে ১৮৯৮-১৯১৩ সালের মধ্যে বিদেশীরা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ হিসাবে বা অন্যান্য খাতে সোভিয়েত দেশ থেকে ৫০০ কোটি রুবল্ নিয়ে গেছে। বিপ্লবের পরে এই বৈদেশিক শোষণের অবসান এনে দিয়েছে জাতীয় অর্থনীতির মুক্তি। সোভিয়েত পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে তার পরেই হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য। তৃতীয় স্থান হল জাতীয় ঋণ এবং কর ব্যবস্থার।

এই ব্যবস্থা যে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তার মাপকাঠি হল জাতীয় অর্থনীতিতে মূলধন বিনিয়োগের আয়তন। নিচের ছকটি দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

পরিকল্পনা	সোভিয়েত দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির লগ্নী (কোটি রুব্ল্-এর হিসাবে)
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—১৯২৯-৩২	৬,৭০০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—১৯৩৩-৩৭	১৫,২০০
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—১৯৩৮-৪০	১৫,১০০

[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে ৩য় পরিকল্পনা শেষ করা সম্ভব হয় নি।]

অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে সোভিয়েত দেশে প্রথম যুগে রাজ্য বাজেটে করের একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল। শিল্পের এবং বিশেষ করে ভারী শিল্পের অগ্রগতির জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের অভাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম যুগে করব্যবস্থার উপর বেশ কিছু পরিমাণে নির্ভর করতে হয়েছিল। যত সোভিয়েত অর্থনীতির অগ্রগতি হচ্ছে ততই বাজেটের অর্থ-সংস্থানে

করের গুরুত্ব কমে গিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আয়ের গুরুত্ব বর্ধিত হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে জাতীয় ঋণপত্র বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ বছরের প্রথম দিকে সুপ্রীম সোভিয়েতের এক অধিবেশনে স্থির করা হয়েছে যে আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর জনসাধারণের উপর থেকে সমস্ত কর-বোঝা তুলে নেওয়া হবে। এই করহীন সমাজব্যবস্থা সম্ভব হবার কারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আয় থেকেই বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ-সংস্থান করা যাবে (বর্তমান বৎসরেই সোভিয়েত বাজেটের ৭৭,৩০০ কোটি, রুব্‌লের মধ্যে ৭০,৩০০ কোটি রুব্‌ল্ এসেছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয় থেকে)।

'রূপকথা' বাস্তবে রূপ পেয়েছে পরিকল্পনার সোনার কাঠিতে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমাদের দেশে যত পরিকল্পনার সংখ্যা বাড়ছে ততই করভার জনসাধারণের উপর গুরুভার হয়ে দেখা দিচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে আরও করবৃদ্ধির (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ) সুপারিশ করা হয়েছে। করব্যবস্থার তুলনায় অথচ জাতীয় বাণিজ্য এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। সোভিয়েত অর্থনীতির সুফল কারা পাবে এবং আমাদের অর্থনীতির সুফলই বা কারা পাবে দুটি দেশের অর্থ-সংস্থানের নীতি দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সোভিয়েত দেশের জাতীয় আয় ও বণ্টন[২]

সোভিয়েত দেশে জাতীয় আয় এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের (এমনকি আমাদের দেশেরও) জাতীয় আয় নির্ধারণ করার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে সোভিয়েত দেশের এক বৎসরের Material production বা বস্তুগত উৎপাদন (যেমন শিল্প, কৃষি, গঠনমূলক কাজ বা construction, যানবাহন, যোগাযোগ এবং বাণিজ্য) থেকে মূলধনী দ্রব্যের সেই সময়ের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মূল্য বাদ দিয়ে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। ধনতান্ত্রিক দেশে এবং আমাদের দেশেও বস্তুগত মূল্য থেকে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ যেমন বাদ দেওয়া হয় তেমনি আবার কিছু কিছু সেবাগত উপকরণের (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমরায়োজন ইত্যাদির) মূল্যে যোগ করা হয়। কোন্ পদ্ধতি

২। V. Belkin—The National Income of the U.S.S.R. and its Distribution.

উৎকৃষ্ট, কোনটি বা নিকৃষ্ট এ নিয়ে তর্ক না করলেও এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে সোভিয়েতের জাতীয় আয় নির্ধারণে যদি সেবাগত বৃত্তির উপকরণগুলির অর্থাৎ অ-ফলপ্রসূ শ্রমের মূল্য ধরা হত তাহলে জাতীয় আয়কে আরও স্ফীত করে দেখানো চলত।[৩] কাজেই সোভিয়েত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ভর করবে কতলোক ওই material production বা বস্তুগত উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তার উপর।

ভোগ এবং লগ্নী এই দুয়ের সমন্বয়ই সোভিয়েত দেশের জাতীয় আয়। কিন্তু ভোগ এবং লগ্নীর আগে জাতীয় আয় সোভিয়েত দেশে একটি বণ্টন-পদ্ধতির মাধ্যমে বন্টিত হয়। জাতীয় আয়ের বস্তুগত উপাদানের বণ্টনের আগে জনসাধারণের ভিতর জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে আর্থিক মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়। (অবশ্য কিছুটা মজুরি জিনিসপত্রের মাধ্যমেও বন্টিত হয়, যেমন যৌথ কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের ক্ষেত্রে)। সোভিয়েতের জাতীয় আয় বণ্টন-পদ্ধতিতে দুটি নির্দিষ্ট ধাপ লক্ষিত হয় : প্রথমটি হল প্রাথমিক বণ্টন ; দ্বিতীয়টি পুনর্বণ্টন।

যে সব লোক বস্তুগত উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের ভিতরই প্রাথমিক বণ্টন সংঘটিত হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের সূত্রপাত হয়। জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টনের সময় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন-কার্যে জড়িত নন (শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক ইত্যাদি) তাঁরা জাতীয় আয়ের মধ্যে তাঁদের অংশ পেয়ে থাকেন।

জাতীয় আয়ের বেশ বড় একটা অংশ রাষ্ট্রের বাজেটে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ পায় সোভিয়েত দেশের শ্রমিকরা এবং বাকি অংশও ব্যয় করা হয় শিল্পের উন্নতি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে। কাজেই জাতীয় আয়ের প্রায় সবটাই ব্যবহৃত হচ্ছে শ্রমিক তথা জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অবস্থা স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ে শ্রমজীবীদের অংশ ছিল শতকরা ৫৪ ভাগ, বর্তমানে শতকরা ৪২ ভাগ মাত্র। ব্রিটেনে ওই দুটির সংখ্যা হল শতকরা ৪৫ ভাগ এবং শতকরা ৪০ ভাগ। কাজেই

৩। এমনকি দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে জাতীয় আয় মাপবার সোভিয়েত পদ্ধতি অনুন্নত দেশগুলিতে খুবই কার্যকরী।

জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক ভোগ করে মালিকশ্রেণী এবং এই অংশেরও আবার বেশির ভাগ জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় একদল একচেটিয়া কারবারীদের হাতে।[৪]

বর্তমানকালে ধনতান্ত্রিক দেশে বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টনের পরিমাণ অনেক বর্ধিত হয়েছে। ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ এবং শতকরা ৩৩⅓ ভাগ পুনর্বণ্টন করা হচ্ছে কারণ এই সব দেশ সমারায়োজনের জন্যই এই বাজেট বৃদ্ধি ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে বাজেটের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ব্যয় করা হয় সমরায়োজনে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হচ্ছে যুদ্ধখাতে, কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাখাতে বাজেটের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ খরচ করা হয়। আবার ধনতান্ত্রিক দেশের বাজেটের অধিকাংশই আসে জনসাধারণের উপর করভার চাপিয়ে; আমেরিকান পরিবারের গড় আয়ের প্রায় তিনভাগের একভাগই এই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর হিসাবে সরকারের হাতে তুলে দিতে হয়। ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চেহারা বিশেষ কিছু আলাদা নয়। অথচ সোভিয়েত দেশে অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। কর প্রসঙ্গে আগেই আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে সোভিয়েত বাজেটে বর্তমানে করের অংশ শতকরা ৭.৮ ভাগ এবং অদূর ভবিষ্যতে তাও লোপ করা হবে।

সোভিয়েত দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অর্থ হল: অর্থনীতির আরও প্রগতি এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য। সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনায়

৪। M. Dobb—Capitalism Yesterday & Today; p. 11—14.

আমাদের দেশেও জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ জনসাধারণের এক অংশের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে; এ বিষয়ের সঠিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় আয় বণ্টন কমিটি'র প্রতিষ্ঠা করেছেন; কাজেই ওই কমিটির রিপোর্ট যতদিন না প্রকাশিত হচ্ছে ততদিন আমাদের দেশে সমস্যার 'সঠিক চেহারা' 'বোঝা' যাবে না। Economic Weekly-তে ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে এ দেশীয় অর্থনীতিবিদ্‌রা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দুটি প্রবন্ধ পড়তে অনুরোধ করি:

ক। B. V. Krishnamurti (The Plan and the U Sector)—Economic Weekly Sept. 24, '60; খ। Kersi Doodhi (Capital formation in the U Sector—Economic Weekly Oct. 29th, '60.

১৯৬৫ সালে জাতীয় আয় ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ৬০-৬৩ ভাগ বর্ধিত হবে।

শুধু জাতীয় আয় বণ্টনের দ্বারাই যে সোভিয়েত দেশের মানুষ উন্নততর জীবনযাত্রার স্বাদ পাচ্ছে তা নয়, সামাজিক ভোগের জন্যও অর্থসংস্থান করা হয়। ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্র ২১,৫০০ কোটি রুবল্ ব্যয় করেছিল সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক সামাজিক ভোগের খাতে। সপ্ত বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৬৫ সালে এই খাতে ৩৬,০০০ কোটি রুবল নির্দিষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিবৎসরে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মাথাপিছু ৩০০০ রুব্‌ল্ ব্যয় হবে।

সোভিয়েত অর্থনীতি আজ দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় পরিচালিত দেশ কত দ্রুত জনকল্যাণের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করলে অবাক হতে হয়। শুধুমাত্র গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার জন্যই যে তারা দ্রুতগতি সম্পন্ন রকেট সৃষ্টি করছে তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রার মানেও বৈপ্লবিক গতি এনে দিয়েছে।

নবজাগরণের মূল্যবিচার

শ্রুতকীর্তি বিপ্লবী নেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের শতজন্ম বার্ষিক উৎসব পালন উপলক্ষে সমালোচ্য স্মারক-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থপ্রকাশ যথার্থই যোগ্য কাজ হয়েছে। কেননা বিপিনচন্দ্র আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হলে মননশীল রচনাসংকলন প্রকাশই সর্বাপেক্ষা কাম্য প্রস্তাব। বিপিনচন্দ্রের বিচারপ্রবণ মন কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শে কেন্দ্রীভূত হয় নি, তাঁর গতিশীল মননপ্রবাহ তাঁর স্বাধীন চিত্তের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তিনি তাঁর স্বাধীন চিত্ততার জন্য বিদেশী ব্রিটিশ সরকার ও স্বদেশী ভাবোন্মত্ত দেশবাসীর উভয়ের কাছ থেকেই নির্যাতন লাভ করেছেন। সত্যকে এই মূল্য চিরকালই দিতে হয়। যোগবাশিষ্টের ভাষায় তিনি 'মননেম হি জীবতি' বাক্যের সার্থকতা ঘোষণা করে গেছেন। তাই বিপিনচন্দ্রের শতজন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মারক গ্রন্থখানির পরিকল্পনা আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য।

গ্রন্থখানির নামকরণ ভালো হয়েছে। তার বিশেষ কারণ এই যে বোধকরি বিপিনচন্দ্রই প্রথমে উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের জাগরণকে 'রেনেসাঁস' নামে আখ্যাত করেছিলেন। এই জাগরণের স্বরূপ বিশ্লেষণে ও যুগনায়ক ব্যক্তিদের চরিত্র ব্যাখ্যায় তিনিই অগ্রণী হয়েছিলেন। কাজেই বিপিনচন্দ্রের চিন্তাক্রমের উত্তরসাধনারূপে গ্রন্থখানি মূল্যবান হয়েছে সন্দেহ নেই। কারণ বহু লেখক নানা দিক থেকে এর পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো দিক নিয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একখণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাঙ্গীণ আলোচনা এর পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। সে অভাব এই গ্রন্থের দ্বারা বহুলাংশে পূর্ণ হবে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতকের বাঙালী জাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। সেই কীর্তিভাস্বর যুগের আলোচনাবাহী গ্রন্থপ্রকাশ বিপিনচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

---

*Studies in the Bengal Renaissance. অতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, যাদবপুর কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৫৮। পনের টাকা।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগে এই ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন উভয় গোত্রের বিশেষজ্ঞ লেখকেরা যুগনায়কদের সম্পর্কে এবং সমকালীন সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম ইতিহাস প্রভৃতি জাতীয়-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির বিবরণ দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলি ইংরেজী ভাষায় রচিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে কৌতূহলী সুধীবর্গ ও সাধারণ পাঠকসমাজ উনবিংশ শতকের ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক সম্পর্কে বহু বিষয় জানতে পারবেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার গ্রন্থখানির নামকরণ বিষয়ে। 'Studies in The Bengal Renaissauce' নামকরণ করা হয়েছে বটে কিন্তু এই নবজাগরণের একটি মোটামুটি কালসীমা ধরলে ভালো হত। এই নবজাগরণের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে পূর্ণালোচিত হতে পারে নি। তিনি ইতালীয় তথা ইউরোপীয় নবজাগরণের ঐশ্বর্যময় রূপের তুলনায় আমাদের জাগরণের 'parochial' রূপটি বুঝিয়ে দিয়ে ভালো করেছেন। তাঁর রচনাটির কয়েকটি মূল্যবান ইঙ্গিত আছে, সুধীজনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কালসীমা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সব প্রবন্ধরচয়িতারা বোধকরি ঐকমত্য বোধ করেন নি। সেজন্য শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ 'Economic background of the Century' প্রবন্ধে প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে থেমে গেছেন। এবং শ্রীসুনীল সেনের 'Economic enterprise' (1833-1914) ঐ প্রবন্ধের পরিপূরক হতে পারে নি। কোনও প্রবন্ধের মধ্যেই যুগের 'totality' পরিস্ফুট হয় নি। তাছাড়া নবজাগরণের ফলে যে জ্ঞানের ব্যাপ্তি, চিন্তার মুক্তি, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাসের মৃত্যু, নবজীবনের প্রভাত ঘটে রচনাগুলির মধ্যে সেই spirit সর্বত্র প্রতিভাত হয় নি। বহুক্ষেত্রেই রচনাগুলি তথ্যস্তূপে পরিণত হয়েছে। রেনেসাঁসকে 'guiding force' হিসাবে বহু ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয় নি, যা ঘটেছিল তার ইতিবৃত্ত দেওয়া হয়েছে মাত্র।

দুঃখের বিষয় এই স্মারকগ্রন্থে 'ভাষা' 'উপন্যাস' 'সামাজিক জীবন' সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধ রচিত হয় নি। বাংলা ভাষা গদ্য ও পদ্যবন্ধে যে কী অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে এই যুগে তার তুলনা অন্য কোনো দেশে মেলে না। অথচ এমন একটি মূল্যবান বিষয়ে কোনও প্রবন্ধ রচনা করবার দায়িত্ব সংকলন-কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নি। তারপর ওঠে উপন্যাসের কথা। শ্রীসুবোধচন্দ্র

সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে এই অভাব পূর্ণ হতে পারে না। আরও উল্লেখযোগ্য যে 'সামাজিক জীবন' (সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে) সম্পর্কে কিছু লেখা হয় নি যদিও প্রবন্ধ-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই এবিষয়ে লিখবার অধিকারী।

আর একটি প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা হল। বাংলাদেশে নবজাগরণ যে সম্পূর্ণ-সার্থক হয় নি বোধকরি এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন। কেননা আমাদের জাগরণের মধ্যেই সুপ্তির লক্ষণ ছিল। আমাদের যুগনায়কদের চিন্তায়, কর্মে ও সামাজিক-জীবনযাপনে স্ববিরোধ ছিল। এ কথাকে অস্বীকার করা অনৈতিহাসিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দান করা। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রেনেসাঁস-এর সঙ্গে 'revivalism' দেখা দিয়েছিল এবং তার প্রভাব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ—এমনকি রবীন্দ্রনাথও মুক্ত ছিলেন না। 'বীরপূজা'-র পরিবর্তে প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিচারের দিকটি প্রাধান্য পেলে আধুনিক মন তৃপ্ত হত।

শেষে বিনীতভাবে কয়েকটি সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করা গেল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সে-ত্রুটিগুলি অপসারিত হবে।

(ক) ভূমিকা—পৃঃ ৸৶০। মধুসূদনকে 'a Derozian' বলা হয়েছে কিন্তু মধুসূদন ডিরোজিও-র শিষ্য বা ছাত্র ছিলেন না।

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পৃঃ ৫০। বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতার জন্য নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে রাঢ়ীয় রক্তের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতার ধমনীতে ঐ একই রক্ত প্রবাহিত হলেও তিনি বিদ্যাসাগর-সুলভ বলিষ্ঠ পৌরুষের অধিকারী ছিলেন না।

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত—পৃঃ ৬১। 'or think R—most probably the prodigious scholor, critic, author, historian and what not Rajendralal Mitra about whom Michael was compelled to write : "He reads Byron, Scott and Moore"—কিন্তু আসলে এই "R" রাজেন্দ্রলাল মিত্র নন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঘ) 'কবিতা'—পৃঃ ২৬১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে লেখা হয়েছে—"most of the would be talents either poets or prose-writers including Rangalal Banerji, Madhusadan Datta, Bankim Chandra Chatterji···clustered round him···" কিন্তু মধুসূদন দত্ত কখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

(ঙ) 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৬৯। বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় লেখা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র মুহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খিলজি জয় করেছিলেন।

(চ) "নাটক"—পৃঃ ২৭৭। 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানটিকে করণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বলে চালাবার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু গানটি 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

(ছ) "ব্রাহ্মসমাজ"—পৃঃ ৪৯৬। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারের বিবাহকে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনকে খর্ব করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অভিনব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কেশব-চন্দ্রের বিচ্ছেদের একটি মূল কারণ কেশবচন্দ্রের 'ব্রিটিশ রাজপ্রীতি' এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও স্বদেশপ্রেম। কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজ চিরদিনই রাজভক্ত। "স্বদেশী আন্দোলনে"র যুগে (১৯০৫) নববিধান ভক্তেরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা সমর্থন করেছিলেন, সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব করেছিলেন।

(জ) নবজাগরণের একটি বড়ো প্রমাণ নারীজাতির মর্যাদা দান। উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাসমাজের যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস হয়েছে "নারী-জগৎ" প্রবন্ধে তার কিছুই লেখা হয় নি। এরকম রচনা এ-সংকলনে স্থান পেল কেন?

এ-ধরনের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে শ্রীপিয়ের ফালোঁ-র প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা অসঙ্গত হবে না। তিনি আধুনিকতা ও খ্রীষ্টধর্মকে সমার্থকরূপে দাঁড় করিয়েছেন। এই ধরনের ব্যাখ্যা 'রেনেসাঁস'-প্রভাবিত মনের প্রতিবাদ। শ্রীসুকুমার মিত্রের 'সংবাদপত্র' প্রবন্ধে সেকালের প্রগতিমুখী 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রিকার নাম থাকলে ভালো হত।

'Studies in the Bengal Renaissance' গ্রন্থখানি পাঠকসমাজ আগ্রহ করে পড়বেন এই আশা নিয়ে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোক্তাদের পুনরায় সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

পুস্তক-পরিচয়

জর্জ বার্নাড শ ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সাড়ে আট টাকা ॥

বার্নার্ড শ নিজের জীবনে সম্বন্ধে বলতেন—'I am not at all interesting biographically.' তা সত্ত্বেও কিন্তু শ'র জীবনকালেই, তাঁর জীবন, সাহিত্য-কর্ম ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে স্বদেশে ও বিদেশে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর কারণটা সহজেই অনুমেয়। অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বার্নার্ড শ তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিভাগুণে ইউরোপীয় চিন্তাজগতের প্রায় অবিসংবাদী নেতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; স্বদেশীয় সমাজের ঘাড়ে যে ভিক্টোরীয় যুগের ভূতটা চেপে বসেছিল, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত শ'র বুদ্ধিমত্তার তীব্র কশাঘাত দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে গোঁড়া রক্ষণশীলতার মর্মে গিয়ে ঘা দিয়েছিল ; আর এই তীক্ষ্ণ মেধার বাহক ছিল শ'র সরস বাক্-চাতুর্য, যার ধাক্কায় সারা বিশ্ব অভিভূত হয়ে থাকত। স্বভাবতই এই রকম একটি মানুষের প্রভাব সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রচণ্ড, এবং সেই টানেই তাঁরা শ'র এই বিস্ময়কর অভিনবত্বের উৎসসন্ধানে, তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাভাষায় এই কাজে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে খুব অল্প লেখককেই দেখেছি। এ অবস্থায়, বার্নার্ড শ সম্বন্ধে কোনো বাংলা গ্রন্থের প্রকাশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় রচিত "জর্জ বার্নার্ড শ" তিন খণ্ডে বিভক্ত। জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত শ'র জীবন আলোচিত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হচ্ছে শ'র 'অ্যান্‌ড্রোক্লিস অ্যাণ্ড দি লায়ন' রচনার উল্লেখে। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে শ'র শেষ জীবনের বিশিষ্ট রচনা ও ঘটনার বর্ণনা—মেথুশীলা, সেণ্ট জোন, মহাযুদ্ধ, রুশ-ভ্রমণ ইত্যাদি। সময়ানুক্রমিক বিবরণের অবকাশে কখনও কখনও শ'র নাটকের ও মতবাদের দু-একটি আলোচনা চোখে পড়ে।

ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—"বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে জীবনীগ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্ভব, এই স্বাভাবিক কারণে, বহু গ্রন্থ, পত্র ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি…।" ফলে বইটিতে বহু ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। বাংলাদেশে পূর্বে অপ্রকাশিত, শ' সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্যও ভবানীবাবু পরিবেশন করেছেন। সেজন্য তিনি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতাভাজন।

কিন্তু শ' প্রসঙ্গে আলোচনায় যে চিন্তাশীলতার প্রয়োজন, প্রায় চারশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি আগাগোড়া পাঠ করে, এই বিশেষ গুণটির একান্ত অভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। মনে রাখা দরকার যে শ' dramatist of ideas নামে পরিচিত ; নিছক কাহিনী রচনার উদ্দেশ্যে নয়। নিজস্ব মতবাদ প্রকাশের হাতিয়ার রূপেই তিনি নাটককে নির্বাচিত করেছিলেন। আর এ মতবাদের ভিত্তি ছিল বাটলার, ইবসেন, নীৎসে ও মার্ক্‌সের চিন্তার স্তর পারম্পর্য। সুতরাং নাট্যকার শ'কে জানতে হলে, তাঁর চিন্তাধারার আলোচনা, শ'-জীবনীর একটি প্রধান অঙ্গ রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। অথচ ভবানীবাবুর বইতে নানা ঘটনার ভিড়ে এই চিন্তাশীল শ'র চেহারাটা প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। সামাজিক পটভূমিকাটা স্পষ্ট করে প্রকাশিত করতে পারলে, এই সব অসংলগ্ন ঘটনাগুলি তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের যথার্থ স্থান খুঁজে পেত ; কিন্তু তার অভাবে শ'র জীবনের নাটকীয় কাহিনীগুলিই অধিক গুরুত্ব পেয়ে গেছে এবং শ' সেগুলির রোম্যান্টিক নায়ক হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এলিস লকেটের সঙ্গে 'প্রথম প্রেম', মিসেস বেসাণ্টের 'অবাধ বিবাহের চুক্তি', মিসেস প্যাটার্সনের সংস্পর্শে 'আদিম পাপের' সূত্রপাত, শ-মে মরিসের প্রণয়ের ব্যর্থতা, এলেন টেরীর সঙ্গে শ'র পত্রালাপের দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা যে "উভয়ের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা দেহাতীত", মিসেস প্যাটিক ক্যামবেলের সঙ্গে 'রোম্যাণ্টিক অভিনয়' কিরূপে "হৃদয়দাহন সত্যে পরিণত হল" ইত্যাদি নানা ঘটনার বৈচিত্র্য অস্বীকার করছি না। কিন্তু সংবাদপত্রের হেড-লাইন রচনার নেশা নিয়ে যেন বৃত্তান্তগুলিকে নির্বাচিত করা হয়েছে ; এদের চাঞ্চল্যকর রূপটাই গ্রন্থকারের মনকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মনে হয়। তাই এলিস লকেটের প্রণয়কে The Unsocial Socialist রচনার মূল প্রেরণারূপে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, এবং মিসেস প্যাটার্সনের উগ্র প্রকৃতিকে এত সর্বগ্রাসী করে দেখানো হয়েছে যে পাঠকের মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে The Philanderer ও

Widowers' Houses-এর রচনার মূল কারণ ও উদ্দেশ্য জেনী প্যাটার্সন। প্রতি লেখকেরই, বিশেষত শ'র জীবনে বহু নারী বহুবার বিচিত্ররূপে এসেছেন; চিন্তাধারা ও সাহিত্যকর্মে তাঁদের প্রভাব শ' নিজেও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু শ'র মতো বুদ্ধিপ্রবণ নাট্যকারের নাটকগুলির রচনার প্রধান উৎসরূপে যদি কেবলমাত্র তাঁর প্রণয়িনী ও বান্ধবীদের নির্দেশ করা হয়, তার ফলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্যে অবস্থিত যে গভীর চিন্তাশক্তি, তা সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। তা আশঙ্কা করেই বোধ হয় শ', ফ্র্যাংক হ্যারিসকে লিখিত চিঠির শুরুতেই বলেছিলেন—"First, O sex-obsessed Biographer, get it into your mind that you can learn nothing about your biographees from their sex-histories." এবং শেষ করেছিলেন এই বলে—"So now, no romance।"

যে শস্তা রোম্যান্সের ও অতি নাটকীয়তার বিরুদ্ধে শ' আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, দুঃখের বিষয় যে সেই রোম্যান্স সৃষ্টির কায়দাতেই শ'র জীবনকে ভবানীবাবু বাঙালী পাঠকের কাছে পরিবেশিত করেছেন। Casanova বা Bean Brummel-এর ঘটনাবহুল জীবনী এই ভঙ্গীতে রচিত হলে, তা সুখপাঠ্য হত; কিন্তু চিন্তানায়ক শ'র ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন অসঙ্গত। ফলে অনেক তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা কেবলমাত্র নাটকীয় মূল্যের জন্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের ছবিটি; ভবানীবাবুর ভাষায়—"ওয়েব চেয়ারে পরিসংখ্যানের কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতেন, আর শ্রীমতী বিয়েট্রিস কোলে শুয়ে থাকতেন"। এই জাতীয় ঘটনার বর্ণনার প্রতি লেখকের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম এবং অন্যান্য পরিচ্ছেদে বার্নার্ড শ'র শারীরিক অসুস্থতার দীর্ঘ বিবরণীর কি যে প্রয়োজন ছিল বুঝলাম না। শ'র পা ভাঙা, শার্লটের সেবা, রোগমুক্তি এবং আবার বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া—এগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বর্ণনা অনেক সময় বিরক্তিকর রুচিহীনতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। এই খণ্ডেরই নবম পরিচ্ছেদে লোরেনের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র বেলুন চড়া ও ভূপতিত হওয়া, সাঁতার কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনা—ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার সন্নিবেশে বইটিকে ভারাক্রান্ত করবার কি দরকার ছিল? ভবানীবাবু হয়তো গল্পচ্ছলে শ'র জীবনী বিবৃত করতে চেয়েছেন; কিন্তু ফল হয়েছে মারাত্মক। কারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিক্ষিপ্ত করে

ঘটনাগুলির বর্ণনার জন্য এবং শ'র রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার প্রায় কিছুই আলোচনা না করার ফলে নাট্যকার বার্নার্ড শ-কে অনেক সময় পাঠকের ডন্ যুয়ান বলে ভ্রম হতে পারে।

এত ঘটনার সমুদ্রের মধ্যে শ'র মতবাদ প্রসঙ্গে যে অল্প কয়েকটি মন্তব্য দ্বীপের মতো ভেসে রয়েছে, সেগুলিও কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণীয়। শ'র রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন লেখক হেনরী জর্জের বক্তৃতা শোনার পর থেকে। বক্তৃতার বক্তব্য, ভবানীবাবুর ভাষায়, "জমির ওপর নির্ধারিত কর হ্রাস করলে মানুষের দারিদ্র্য এবং কষ্ট কমানো যায়।" হেনরী জর্জ কিন্তু অন্যান্য সব কর তুলে দিয়ে শুধুমাত্র জমির উপর Single tax ধার্য করার প্রস্তাব এনেছিলেন। শ'র রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, শ' 'আমরণ কম্যুনিস্ট ছিলেন' (পৃঃ ৪৮) এবং তিনি "প্রথম জীবনে সোস্যালিস্ট এবং পরে কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন" (পৃঃ ১৪১)। শ' অবশ্য ছিলেন a good man fallen among the Fabians, কিন্তু তাঁকে কমিউনিস্ট বললে অতিশয়োক্তি করা হয়। শ' ফেবিয়ানদের মধ্যে সব চেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন। সোভিয়েত সমাজকে তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ও সহানুভূতির চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু মূলতঃ শ' আমরণ ছিলেন ফেবিয়ান। বস্তুত শ'র সমগ্র জীবনদর্শনের বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে নিহিত রয়েছে এই ফেবিয়ান রাজনীতি গ্রহণের মধ্যে। সুতরাং শ'-কে সরাসরি কমিউনিস্ট বলে বর্ণনা করাটা হঠকারিতা। মার্কসের ছাত্র শ', সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও, শ্রমজীবী সমাজকে পৃথিবীর মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। তার পরিবর্তে নীৎসের প্রেরণায় পরিকল্পিত অতি-মানবের স্বপ্ন, শ'র কাছে আরও প্রীতিকর ছিল।

ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থার নৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে শ'র যে অভিযান, তার পথে স্যামুয়েল বাটলারের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনি, তাঁর দার্শনিক মত সৃষ্টির পিছনে নীৎসের পরোক্ষ প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই দুজনকেই ভবানীবাবু প্রায় উপেক্ষা করে চলে গেছেন। এলিস লকেট ও মিসেস প্যাটার্সনের থেকে এইসব চিন্তানায়কদের প্রতি আর একটু বেশী মনোযোগ দিলে গ্রন্থটি হয়তো অনেক ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারত।

ভবানীবাবুর লেখার পদ্ধতি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। শ' প্রবর্তিত প্যারাডক্সের কায়দায় কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যেগুলিকে অতি সরলীকরণ বলে মনে হতে

পারে। যেমন—"বার্নাড শ' রসিক কিন্তু রসজ্ঞান কম, ওয়েবের সরসত্ব কম কিন্তু রসবোধ অসীম।" বা এই বাক্যটি—"শ ছিলেন ধর্মশীল, খ্রীষ্টান ধর্মনীতির নিন্দা করলেও মনেপ্রাণে তিনি খ্রীষ্টীয়নীতির পরিপোষক।" ঘটনা সাজানোর ব্যাপারেও একধরনের শৈথিল্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে Man and Superman-এর দীর্ঘ আলোচনা আছে; তার পরের পরিচ্ছেদে হঠাৎ Arms and the Man (যেটি বহুকাল পূর্বে রচিত)-এর সমালোচনা দেখতে পাই। এ ছাড়াও পুনরুক্তি দোষ রয়েছে। গ্র্যানভিল বার্কারের সঙ্গে শ'র পরিচয়ের সূত্রপাত, সে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়া এবং বার্কারের মৃত্যু উপলক্ষে শ'র প্রবন্ধ—ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে দশম পরিচ্ছেদে। আবার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শ'র প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে লীলা-শ-বার্কারের সম্পর্কের সবিশেষ বর্ণনা রয়েছে। কিছুটা যত্নবান হলে এসব ত্রুটি এড়িয়ে বইটিকে সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া যেতে পারত।

মোট কথা, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'জর্জ বার্নাড শ' বইটিতে বর্ণিত কাহিনীর চমকপ্রদ মিছিল, গল্পশ্রবণেচ্ছু পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল পাঠককে হতাশ করবে। ভবানীবাবুর মতো সুপরিচিত লেখকের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী অনুশীলন ও বিচক্ষণতার পরিচয় আশা করেছিলাম।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৫৭ ও বাংলাদেশ ॥ সুকুমার মিত্র। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। দু টাকা পঁচাত্তর ন. প. ॥

উনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র ॥ সুকুমার মিত্র। এভারেস্ট বুক হাউস। তিন টাকা ॥

উনিশ শতকের নবজাগৃতি প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে পত্রপত্রিকায় বিদগ্ধজনদের যে বিতর্ক উঠেছিল, তাতে সবচেয়ে প্রকট মতভেদ ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের মূল্যায়নে। সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্র কি? মার্কসবাদের দৃষ্টিপ্রদীপ তুলে ধরেই অনেকে ভিন্ন মতে পৌঁছেছেন, অ্যাকাডেমিসিয়ানদের কথা বলা বাহুল্য—কেননা ব্যক্তিক সংস্কারই (personal bias) সেখানে

গবেষণার নিয়ামক। সিপাহী-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে স্বদেশে-বিদেশে নানা ভাষায় বহুমূল্য প্রবন্ধ ও তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এককথায় কেউ আর 'কতিপয় স্বার্থন্বেষীর চক্রান্ত' বলতে পারছেন না। এতদিন রজনীকান্ত গুপ্তের বৃহৎ তিন খণ্ড দুষ্প্রাপ্য বই ছাড়া কিছু ছিল না। এখন জিজ্ঞাসু পাঠক নানাভাবে সিপাহী-বিদ্রোহ ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাকে যাচিয়ে দেখার প্রচুর উপকরণ পাবেন। সুকুমার মিত্রের বই দুখানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র' গত শতকে বাঙালীর ইংরেজ-বিরোধের ঐতিহাসিক নির্ঘণ্ট। সাময়িকপত্র, সেকালের সম্পাদকীয় মন্তব্য, পুস্তক-সমালোচনা আত্মচরিত, বিদেশীদের বিবরণী প্রভৃতি থেকে শ্রীযুক্ত মিত্র তথ্যাবলীর সারসংকলন করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, রংপুরের কৃষক-বিদ্রোহ, বগড়ীর নাএক-বিদ্রোহ, নারকেলবাড়িয়ার যুদ্ধ, নীল-বিদ্রোহ, টিপু পাগলার বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। সব খণ্ড বিদ্রোহের চরম রূপ ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে। সেই ঘটনা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; কিন্তু আলোচিত হয় নি। তার পূর্ণ পরিচয় পাই লেখকের '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে। তাই বই দুখানির আত্মীয়নৈকট্য সাধারণ সম্পূরক গ্রন্থের (companion volume) চেয়ে বেশি। দুটি গ্রন্থ একটি অখণ্ড পরিকল্পনার অন্তর্গত। সত্যি কথা বলতে গেলে নাম, প্রকাশনা ও প্রচ্ছদ-আবরণ মাত্র স্বতন্ত্র; পর পর পড়লে একটি গ্রন্থপাঠের রসাস্বাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণে দুয়ের মধ্যে তুলনার আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় হলে চোখে পড়ে প্রথম বইতে রচনাশৈথিল্য, বিচ্ছিন্ন মন্তব্য সমধিক, দ্বিতীয়টিতে লেখকের বক্তব্য অপেক্ষাকৃত ধীর গম্ভীর ও বিস্তৃত তথ্যাশ্রয়ী ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তবু ফকির সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, নাএক-বিদ্রোহ, টিপু পাগলার বিদ্রোহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মিত্রের আলোচনা অধীত বিষয়ের পুনঃস্থাপনামাত্র নয়। বহু অমীমাংসিত প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তিসম্মত অনুমান হারানো সূত্র খুঁজে পাবার হদিশ দিয়েছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে লুঠেরাদের উপদ্রব বলেছেন। এখানে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রভাব সক্রিয়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক পারম্পর্য বিচার করে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যাবলী থেকেই প্রমাণ করেছেন, উনিশ শতকের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ 'এক ধরনের কৃষক-বিদ্রোহ'। নতুবা পারলিং-এর উক্তি নিরর্থক হয়ে পড়ে: 'রায়তরা তেমন

সাহায্য তো করেই নি, বরং তারা লাঠি নিয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং লম্বা ঘাস ও জঙ্গলের মধ্যে যারা লুকিয়েছিল তাদের তারা সন্ন্যাসীদের দেখিয়ে দেয়। যদি কোনো সিপাই তাদের গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে সন্ন্যাসীদের ডেকে আনার জন্য তারা হল্লা করে।' (৩৩ পৃঃ উদ্ধৃত) এ সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত : ১। সন্ন্যাসীরা দেশের রাজশক্তির সমর্থনপুষ্ট, তাই বিদেশীদের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে চায় নি ; ২। কৃষক ও বিক্ষুব্ধ জমিদারদের সমর্থনে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ হয় ; ৩। প্রধানত কৃপণ. ধনী ও বিশেষত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকা লুঠে এদের নৈতিক নিষেধ ছিল না। যত সহজে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাঁর যৌক্তিকতা স্বীকার করেও মনে হয়, এ প্রসঙ্গে শেষ কথা উচ্চারণ না করাই শ্রেয়ঃ। আনন্দমঠ অনুসরণে রচিত উপন্যাসগুলির কথা বর্জিত হল কেন?

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ', প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তান্তিয়া ভীল' প্রভৃতি অবজ্ঞাত রচনাকেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংযুক্ত করে লেখক ভারতবাসীর ইংরেজ-বিরোধে কৃষকদের সক্রিয় ভূমিকাটি স্পষ্ট করেছেন। ব্রাহ্ম-নীতিবাদী পত্রিকা সঞ্জীবনীর মন্তব্য সত্যি উপেক্ষনীয় নয়। "তাঁতিয়া এই রূপে নানা স্থানে ডাকাইতি করিয়া বহু ধন উপার্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কখনও স্বার্থপরের ন্যায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। ...কত কৃষককে যে তাঁতিয়া হালের গরু ও শস্যের বীজ কিনিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।" কিন্তু যে কোনো আন্দোলনে কৃষক সংস্পর্শ দেখলেই তার প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকারে আগ্রহ সহজেই বিভ্রান্তিকর হতে পারে। (মধ্যপ্রদেশের ডাকাত মানসিংহের জনপ্রিয়তা না থাকলে তার আত্মগোপন সহজ হত না।) অবশ্য, কোথাও এমন বিভ্রমে লেখক পতিত হয়েছেন—একথা বলা আমার অভীষ্ট নয়। তবে অনেক ছোট ছোট বিক্ষোভের ঘটনাকেও (যেমন টিপুর ধর্মসংস্কারমূলক আন্দোলন) বৃহৎ তাৎপর্য আরোপের প্রবণতা সর্বদা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে ঐতিহাসিকের বিবিক্ত বিচারকের ভূমিকায় সুস্থির রাখতে পারে নি।

পূর্বেই বলেছি, তুলনায় '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' সুষ্ঠুতর রচনা। নয়টি ছোট বড় অধ্যায় এবং পরিশেষে ভোলানাথ চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার গ্রন্থটির ১৩৬ পৃঃ পরিধি নিয়ন্ত্রিত। রক্ষণশীল ঐতিহাসিক, স্বদেশী বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী এবং প্রগতিশীল

আলোচকদের মতভেদ সামনে রেখে শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। কাউকে অবজ্ঞা যেমন করেন নি, তেমনি ঐতিহাসিক কর্তব্য-বোধেই তিনি গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত সমালোচকদের মন্তব্যে অনাস্থা জানিয়েছেন। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের অধিকারী হয়েও অপর সমদৃষ্টি ব্যক্তির প্রভাবমুক্তি বাংলা মার্কস্‌বাদী আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য অভিনন্দনযোগ্য। লেখক নিজে প্রবীণ সাংবাদিক। তাই তিক্ত অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, যা ঘটে সব সত্য নয় এবং যা প্রকাশিত হয় তার অল্পই ঘটনা। সুতরাং সংবাদপত্রের সাক্ষ্যের মতো প্রহসনাত্মক আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে 'মিথ্যাময়ী' বলেছেন, ইতিহাস সংবাদপত্র-নির্ভর হলে সে মিথ্যার পরিমাণ আরো বাড়ে। '১৯০৫ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের নাম-করা কাগজগুলির পৃষ্ঠা উল্টোলে বাঙালী জাতির বিপ্লবী মনোভাবের কতটুকু পরিচয় পাওয়া যাবে?' সুকুমার মিত্রের এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর নেই। তথ্য নিয়ে যেমন ইতিহাস, তেমনি তথ্যের অভাবও ইতিহাস-সত্যের ইঙ্গিত দেয়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব স্পষ্টভাষণেই কেবল প্রকাশিত হয় নি ; কূট-নীতিজ্ঞের কৌশলে প্রকৃত মত অনেকাংশে আচ্ছন্ন হয়েছে। অত্যাচারী ঔরঙ্গজেব অত্যাচারী ইংরেজের এবং স্বাধীনতাকামী প্রতাপসিংহ ও প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতাকামী আধুনিক বাঙালীমনের রূপক হিসেবে সেদিনও গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর রচনায় স্পষ্টোক্তির অভাব কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর : 'জুতোর চোটে'। অর্থাৎ ইংরেজের তাড়নায়। এই আলোকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মিত্রের পর্যালোচনা যথার্থ। 'All his *manoeuvers* during the period of the Sepoy Rebellion will probably never be revealed, but he had *sufficient craft* to make it appear to Duff and the officials of the Foreign office that he was a highly deserving and loyal subject." টমাস এডওয়ার্ডসের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের বিরোধ ছিল না ; এবং লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়, সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সম্পর্কে এডওয়ার্ডসের বহু তথ্য জানা থাকলেও কাগজে-কলমে কোনো প্রমাণ দক্ষিণারঞ্জন রেখে যান নি বলেই তিনি স্পষ্ট দোষারোপ করতে পারেন নি। দক্ষিণারঞ্জনের জীবনী পূর্বাপর যাঁদের বিদিত, তাঁরা নিশ্চয়ই 'All his life

Duckinaranjan Mookherjee lived in the midst of scheming and intrigue' মন্তব্যও স্বীকার করবেন। এ-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর বলে পরিত্যক্ত হল।)

সমকালীন সাহিত্যে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব লেখক সযত্নে উদ্ধার করেছেন। উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'নানাসাহেব' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসের আলোচনা সময়োচিত হয়েছে। চন্দ্রা উপন্যাসে আনন্দমঠ ও পুশকিনের 'Captain's Daughter' উপন্যাসের প্রভাব প্রদর্শনে লেখকের সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় পাই। চণ্ডীচরণ সেনের 'ঝান্সীর রাণী'ও বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত উপন্যাস। তার কারণ সেকাল-প্রচলিত সম্ভাব্য সকল তথ্যের সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও বইটির সাহিত্যিক মূল্য সামান্য। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের দীপ্ত প্রতিভায় তখন বাঙালী পাঠক মুগ্ধ, চণ্ডীচরণের রচনা তাই সাধারণের হৃদয় জয়ে সার্থক হতে পারে নি। তবু একালের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় বইটির নতুন মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল। সে দায়িত্ব পালন করে লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শক্তিমান লেখক হিসেবে নগেন্দ্র গুপ্ত স্বীকৃত; তাঁর কোনো কোনো রচনাতেই আধুনিক ছোটগল্পের রূপ ধরা পড়ে। সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম, ইংরেজ-শাসন থেকে মুক্তির আগ্রহ যেমন সিপাহীদের একাংশকে উৎসাহিত করে, তেমনি অমানুষিক বর্বরতা, অর্থহীন রক্তোন্মাদ, উচ্ছৃঙ্খলতাও যে উপেক্ষনীয় নয়, 'অমরসিংহ' তার নিদর্শন। শিক্ষিত বাঙালীর দ্বিধা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রস্ফুট।

'ইতিহাসের ইতিকথা' খণ্ডে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চার পরিচিতি আছে। রজনীকান্ত গুপ্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের আলোচনার সারমর্ম সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখক তাঁর বক্তব্য এবং বিশেষ অনুমানগুলিকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেই এই খণ্ডের অনুরাগী হবেন।

'পরিশিষ্ট' অনায়াসে মূল গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে অংশত অন্তর্ভুক্ত হতে পারত, বাকি তথ্য অপরিহার্য নয়।

পরিশেষে বই দুটির ভাষা নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক। 'চলিত ভাষা' মানে যা বলি তাই লেখ্য নয়। "'অনিবার্যতা'-তত্ত্ব মেনে নিলে বাঙালী মধ্যবিত্তের তো উদ্বাহু হয়ে ইংরেজ-প্রশস্তি গাওয়া এবং সিপাহী বিদ্রোহের

নিন্দা চটকানোই উচিত ছিল, কারণ তাতে লাভের আশাই ছিল ষোল আনা।" বাক্যগঠনে শৈথিল্য তাঁর প্রধান দোষ। কোনো একটি দৃষ্টান্তে বোঝানো যাবে না। হয়তো দ্রুত রচনা শেষ করায় এমন হয়েছে। দুই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দেখেও সেই ধারণা দৃঢ় হয়। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে শ্রীযুক্ত মিত্র শুধু নতুন তথ্য আহরণে নয়, পরিশেষ সৌকর্যের দিকেও যথোচিত দৃষ্টি দেবেন। বাংলা সাহিত্যের নানা পর্ব ও ভাবধারাকে যখন নতুনভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তখন সুকুমার মিত্রের বই দুইটির প্রকাশনা অবশ্য সাহিত্য-ইতিহাসপাঠে সহায়ক হবে।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রাত্রির বয়স ॥ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। গ্রন্থ ভবন। সাড়ে তিন টাকা ॥

সাদা ভাবে লেখা কয়েকটি গল্প। চমকপ্রদ ঘটনা-সংস্থান নেই, বিস্মিত হবার মতো পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস নেই, চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষের মাথা ছাড়িয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে না, গুরুতর কোনো সমস্যা নিয়ে লেখক বিশেষ পীড়িত নন বোঝা গেল। যে সমস্ত বিষয় প্রায়ই সকলের নজরে পড়ে, অথবা নিজের চোখে না দেখেও অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়—এ গল্পগুলি সেই নানা জীবনের টুকরো কাহিনীর মালা। সরল, সংক্ষিপ্ত, রম্য, উপভোগ্য।

উপভোগ্য কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর নয়। এ গল্পগুলি পড়ে আমি মুগ্ধ হই কিন্তু আমার অনুভূতিকে আন্দোলিত করে না, আমার মস্তিষ্কের কোণে আগুন জ্বালায় না, আমার অবয়বহীন অস্তিত্বকে বিবৃত করে না।

তাবলে সব গল্পই যে আমার চৈতন্যকে উত্তেজিত করবে এমন আশা করি না। স্বাভাবিক, মিষ্টি গল্প লেখার দিন যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে একথাও বলার সাহস নেই। সেই দিক থেকে এ বই-এর বেশ কয়েকটি গল্পই অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। এমন অনাড়ম্বর ভাবে গল্প জমিয়ে তোলাও কম প্রশংসার বিষয় নয়। 'রাত্রির বয়স', 'নীড়', 'আহ্বান' প্রভৃতি গল্পগুলির বাঁধুনি নিখুঁত।

কিন্তু সহজ ভাষায়, সাদাসিদে গল্প লেখার মধ্যে লেখকদের একটা বড় পরীক্ষা আছে। অধিকাংশ লেখকই লোভে পড়ে যান। এ ভাবে গল্প তৈরি

করা শক্ত। আর শক্ত বলেই প্রচণ্ড ঝোঁক আসে—কত সাধারণ ভাবে গল্প লেখা যায় দেখা যাক। কিন্তু এ পরীক্ষায় সফল হন মাত্র দু-একজন—আপাততঃ রবীন্দ্রনাথ এবং মানিকবাবুর নাম মনে পড়ছে।

গৌরীশঙ্করবাবু যদি একটু চেনাগণ্ডীর বাইরে পা বাড়াতেন—ভাষা যদি একটু প্রতীক ধর্মী করতেন—তবে আমার মনে হয় এ বই-এর দু-একটি গল্প যথার্থ ব্যঞ্জনাময় গল্প হতে পারত, বিশেষ করে 'ধ্রুপদী খেয়াল' এবং 'রাত্রির বয়স' গল্প দুটি। ধ্রুপদী খেয়ালের স্যামুয়েলের নিরাশক্তিকে তিনি ঠিক মতো ব্যবহার করলেন না, 'রাত্রির বয়স' একটা চমক দিয়ে শেষ করলেন। মেয়েদের বয়স আবার কম বেশি কি—অধিকাংশ রাত্রিবেলার যুবতীই দিনের বেলা বৃদ্ধার মতো পান্সে। আসলে ধার করা শাল গায় দিয়ে, চেয়ে আনা বেশি দামের টিকিটের চেয়ারে বসা নিলয়েন্দ্র সকালবেলা কি নিজের দিকে একবারও তাকিয়েছিল? সেইটাই ছিল আসল গল্প। সকালবেলা সে নিজের সেই অদ্ভুত দীনতার দিকে না তাকিয়ে সে কেন শুধু শুধু একটা মেয়ের বয়েস নিয়ে মাথা ঘামাতে গেল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মনের আকাশ ॥ সঞ্জয়। গ্রন্থজগৎ। দু টাকা॥

জীবনের রঙ ॥ সঞ্জয়। গ্রন্থজগৎ। এক টাকা॥

নবীন লেখকের দুটি ক্ষুদ্র কাব্য সঙ্কলন। তরুণতর কবিদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে স্বল্পখ্যাত প্রকাশকের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সৈনিকের প্রাণবীণা ॥ চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। যুগসাহিত্য মন্দির। এক টাকা॥

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট্ট ভূমিকায় জানা যায় এই পদ্যসঙ্কলনের লেখক 'সৈনিক সাহিত্যিক'। প্রকাশকের ক্ষুদ্র ঘোষণায় বোঝা যায় ইনি 'কাললাঞ্ছিত বঙ্গসমাজের উদ্দেশে ইতিহাসের আশীর্বাদ'।

জীবনের জয়গান ॥ উমাপদ ঝা। দু টাকা॥

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কবির মনোভাবের সরল প্রকাশ সম্বলিত ৮৯টি পদ্যের সঙ্কলন।

মৃত্যুশোক ॥ যতীন চট্টোপাধ্যায়। মনীষাতীর্থ। এক টাকা॥

স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকার্ত-হৃদয়ের কাব্যবিলাপ। কবির দু-একটি 'অল্প বয়সের রচনা'-ও আছে। কবি-পত্নীর দুটি রচনা গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত হয়েছে।

স্বাক্ষর ॥ সম্পাদক: জিতু গুপ্ত। পরিবেশক: ডি. হাজরা এণ্ড কোং। বোর্ড বাঁধাই: দু টাকা॥

'ভারতী লেখক সংঘ' কর্তৃক মূলত সভ্যদের রচনা প্রকাশের সংগঠিত প্রয়াস হিসেবে কবিতা ও গল্পের এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা বিভাগে কয়েকজন প্রবীণ কবির রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বাকি লেখাগুলি নবীন লেখকদের।

কংকাল ॥ নাট্যরূপ: জিতু গুপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার। পঞ্চাশ নয়া পয়সা॥

পরলোকগত যোগেশ চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের মুখে গল্প শুনে তার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া লিখে যান। রবীন্দ্রনাথ-কথিত কাহিনীর অন্যতর শ্রোতা শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয় 'কঙ্কাল' নামে সেই কাহিনীরই একটি চলচ্চিত্র রূপ তোলেন। যদিচ চলচ্চিত্রে কাহিনীকারের কোনো নাম ছিল না। ফলে এ নিয়ে একদা কিছু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। নবীন নাট্যকার চৌধুরী মহাশয়ের খসড়ার সংক্ষেপিত নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

মুদ্রণপ্রমাদ

কার্তিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র কৃত 'মুখের মেলা' কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনায় দুটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে।

৪৩৫ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে আছে: মণীন্দ্র রায় যোদ্ধা, মানবদরদী ও প্রগতিশীল কবি। এটির শুদ্ধপাঠ হবে: ···যোদ্ধা, মানবদরদী ও প্রগতিশীল কবি।

৪৩৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারার প্রথম লাইনে 'বক্তব্যভার'-এর বদলে 'বক্তব্যতার' হবে।

—পরিচয় সম্পাদক

সাংস্কৃতি-সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

শিল্পী মণি রায়ের দেহাবসান হয়েছে।

জীবন তাঁর সহজ ও সফল ছিল না। শেষ বয়সে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিন গেছে। এক অর্থে তিনি বাংলা দেশের শিল্পীর মৃত্যুই বরণ করেছেন।

জীবনে ও মননে তিনি ছিলেন অগ্রগতির পক্ষে। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একদা পোস্টার-চিত্র অঙ্কনে তিনি প্রভূত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সোমনাথ হোড় প্রমুখ তদানীন্তন তরুণ শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

খ্যাতি বা অন্য কোনো মোহ তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি।

শান্তিনিকেতন : সেকাল ও একাল

ক্যাথিড্রাল রোডে আকাদেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। উদ্যোক্তা ছিলেন ইণ্ডিয়ান টিউব-এর কর্তৃপক্ষ ও টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর প্রচার বিভাগ। রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গান অথবা যন্ত্রসঙ্গীতের মৃদু আভাষ প্রদর্শনীভবনে এক সুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহার ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে নানা সময় ও উপলক্ষে তোলা ১৫০টি আলোকচিত্র এই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল।

প্রায় চার দশক আগে শম্ভুবাবু তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেন। তখন আমাদের দেশে আলোকচিত্র সম্পর্কে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল সামান্য। তাছাড়া প্রয়োজনীয়, এমনকি অপরিহার্য নানা উপাদানের অভাবও ছিল যথেষ্ট। সুতরাং শ্রীযুক্ত সাহার প্রাথমিক শিল্পীজীবন যথেষ্ট প্রতিকূল ছিল একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

গত অর্ধ শতাব্দীতে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে ক্রমে

ক্রমে নিজের যোগ্যতা, অধিকার প্রমাণ করেছে। যদিও ফোটোগ্রাফি আর্ট কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমাদের রসানুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের জয় স্বীকার না করে পারে না।

বাংলা দেশে, তথা ভারতবর্ষে আলোকচিত্রকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত করার জন্য যাঁরা অপরিসীম নিষ্ঠা ও শিল্পানুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন, শম্ভু সাহা তাঁদের একজন। এই প্রবীণ শিল্পীর নির্বাচিত চিত্রের প্রদর্শনী তাই এক হিসেবে তাঁর ও আমাদের দেশের আলোকচিত্রশিল্পের যে আন্দোলন তার পরিণতি বুঝতে দর্শককে সহায়তা করে।

তাছাড়া এই প্রদর্শনীর বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। শ্রীযুক্ত সাহা একদা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তার সুফল আমরা প্রদর্শনীকক্ষে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের দশটি প্রতিকৃতি এই প্রদর্শনীর সম্পদ। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এগুলির উচ্চপ্রশংসা করে গেছেন। শিল্পীর এ বড় কম পুরস্কার নয়! তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশাল ও কর্মময় জীবনের কতগুলি পর্যায়ের এমন ব্যাপক, অন্তরঙ্গ ও প্রামাণ্য নিদর্শন বড় একটা দেখা যায় নি। শান্তিনিকেতনের নানা অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক জীবন, বিশিষ্ট অতিথি সমাগম এবং সেখানকার প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্য শিল্পসম্মত নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে সহজলভ্য। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ এই দুটি নাম আমাদের কাছে মন্ত্রের মতো কাজ করে। সুতরাং তার প্রামাণিক ইতিহাস সংরক্ষণ করে শম্ভুবাবু উত্তরকালের মানুষের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন। তাছাড়া শিল্প হিসেবে এই ছবিগুলির অসামান্য মূল্য তো আছেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত সাহার শিল্প-জীবনে বারবার মডেল হয়েছেন—এতবড় সৌভাগ্যই বা কজন শিল্পীর হয় ?

এস. পি. গাওয়াণ্ডেও একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী। ইনি কিছুকাল চিত্রবিদ্যা চর্চা করেছেন, ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়ে লণ্ডন গেছেন উচ্চ শিক্ষালাভ করতে। তারপর কিছুকাল প্রচারশিল্পীর কাজ করেছেন বোম্বাইয়ে, বর্তমানে টাটা কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৬ থেকে ৫৮ পর্যন্ত ইনি জামসেদপুরের ফটোগ্রাফিক এ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল-এর সভাপতি ছিলেন। এঁর শিল্প-কর্মের নমুনা আমরা আগেও একাধিক প্রদর্শনী বা পত্র-পত্রিকায় পেয়েছি।

'বর্তমান' শান্তিনিকেতনের কয়েকটি আলোকচিত্রে সে নৈপুণ্য অব্যাহত।

শম্ভুবাবুর ছবিগুলি যদি সেকালের নিদর্শন হয় তবে প্রদর্শনীর অন্য শিল্পী এস. পি. গাওয়াঙের ছবিকটি হল একালের দলিল। বলাবাহুল্য একালের শান্তিনিকেতন যে বদলেছে, বদলাচ্ছে—তার ব্যাপক রূপটি গাওয়াঙের চিত্রমালায় পরিস্ফুট নয়।

শতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে এই প্রদর্শনী অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রকৃত চরিত্রটি বোঝার পক্ষে ছবিগুলি বিশেষ সাহায্য করবে। শ্রীযুক্ত শম্ভু সাহার কাছে এই প্রসঙ্গে একটি বিনীত নিবেদন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহুমুখী দিকগুলির কোনো-কোনো রূপ বাদ গেছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি একবার চিন্তা করুন। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে আরও কি কি বিস্ময় আছে আমাদের তা জানা নেই। হয়তো আছে—সেই বিশ্বাসেই এ প্রসঙ্গের উত্থাপন।

সমকালীন শিল্পী-সংঘ

সম্প্রতি কয়েকজন তরুণ শিল্পী সমকালীন শিল্পধারা সম্পর্কে পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং শিল্পানুরাগী জনসাধারণের সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। এদেশে শিল্পজগতের 'সাফল্যে'র চাবিকাঠিটি অনিবার্যভাবে সেই সব মুরুব্বীদেরই হাতে—প্রতিভা ও নিষ্ঠা সাধারণত যাঁদের কাছে নিতান্ত অবহেলার বস্তু। তাই তাবৎ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ সংগ্রাম, প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা এবং দেশবাসীর সামনে আধুনিক শিল্পের বিচিত্র ও বিশিষ্ট চরিত্রটি তুলে ধরার মহৎ উদ্দেশ্য এই সংগঠন ঘোষণা করেছেন। সভ্যদের চিত্র ও ভাস্কর্যের একটি গ্যালারী এঁরা ইতোমধ্যে স্থাপন করেছেন। আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী, আলোচনা-সভা প্রভৃতি এই সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম। প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা অবধি সংঘের গ্যালারীতে (৭এ, মহীশূর রোড; কলকাতা-২৬) এঁরা আধুনিক শিল্প বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

অদূর অতীতে বেশ কয়েকবার চিত্রশিল্পীদের কয়েকটি সংগঠন গড়তে দেখা গেছে। বর্তমানকালের প্রায় প্রতিটি প্রখ্যাত আধুনিক শিল্পীই তার কোনো না কোনোটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগঠনগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্যও ছিল সৎ, আন্তরিক। কিন্তু কোনোটিই পরিপূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি।

প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের শেষ সম্মেলনে স্থির হয়েছিল চিত্রশিল্পীদের সমস্যা আলাদা এবং তার জন্য দরকার পৃথক সংগঠন। ফলে প্রগতিশীল লেখক সংঘের জন্ম, যা আস্তে আস্তে উঠে গেল এবং শিল্পীদের সেই আকাঙ্খিত সংগঠন গড়েই উঠল না। দর্শককে আধুনিক শিল্প সম্পর্কে আগ্রহী, শিক্ষিত ও শ্রদ্ধান্বিত করার অন্যতম দায়িত্ব ছিল শিল্পীদেরও। তা তাঁরা নানা কারণেই পালন করেন নি, করতে পারেন নি। ফলে দর্শক ও শিল্পের মধ্যে অর্থাৎ দেশবাসী ও শিল্পীর মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েই গেছে তার অনিবার্য কুফল আমরা অনেক আধুনিক শিল্পীর জীবন ও প্রয়াসে দেখেছি। সময় এবং সমাজ-সম্পর্ক বিরহিত হয়ে তাঁরা ফর্মসর্বস্বতা বা অনুকরণের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত থেকে হয় ভুলভাবে এই ভ্যাকুয়াম দূর করতে চেয়েছেন নয় অহং সত্য জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে ক্রমে দেশে ব্যর্থ শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন। (অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বদাই থাকে।) তাছাড়া আছে শিল্পীর জীবিকার সমস্যা এবং শিল্পের নিজস্ব ও অনিবার্য নানা সমস্যা।

হাতের কাছে নাট্যজগতের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আছে। প্রথম যুগের 'বহুরূপী' তার নাটক নির্বাচন ও প্রয়োগাভিনয়ের অসামান্য শিল্প-সফলতার জন্য এবং বর্তমানের লিট্‌ল্ থিয়েটার তার সমবায়ভিত্তিক মঞ্চ ও সংগঠন পরিচালনা আর দর্শকদের অনুপ্রাণিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের কাছে স্মরণীয় থাকবেন। এই দুই গুণ যেদিন এক সংগঠন সমভাবে অর্জন করবেন সেদিন নতুনতর ইতিহাস সৃষ্টি হবে। লিট্‌ল থিয়েটার সে পথেই এগোচ্ছেন বলে মনে হয়েছে।

চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এ-জাতীয় সংগঠন। যা শিল্প-শিল্পী ও দর্শকের ত্রিবিধ সমস্যা মেটাবে। নিষ্ঠা ও তিতিক্ষায় তা সম্ভব। 'সমকালীন শিল্পী-সংঘ' তাঁদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পালনে কতখানি সৎ ও যত্নবান আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। আর দেশবাসীর কাছেও নিবেদন তাঁরা এঁদের উদ্যমের সব থেকে বড় সহায় ও অতন্দ্র পরীক্ষক-সমালোচক হন। তাহলে ইচ্ছা থাক আর না থাক জীবনের, সমাজের, সময়ের কাছ থেকে এঁরাও শিক্ষা নিতে বাধ্য থাকবেন।

সম্প্রতি আর্টিস্ট্রি হাউসে এই সংঘের সতেরো জন সভ্যের আটচল্লিশটি চিত্র এবং তিনজন সভ্যের দশটি ভাস্কর্যের একটি নির্বাচিত ও মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে।

নমিতা দত্তের 'ছটপূজা', 'গোয়ালিনী' ও 'গসিপ্'—এই তিনটি প্রথানিষ্ঠ ভঙ্গিতে আঁকা চিত্রকর্ম ছাড়া বাকি সবকটা চিত্রেই আধুনিক শিল্পীদের বিভিন্ন প্রয়াস ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য দুর্লক্ষ্য নয়। যদিও পাশ্চাত্য মডার্ন আর্টের শেষতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে স্তর, বর্তমান শিল্পীরা তার থেকে অনেক দূরে আছেন বা থাকা সঙ্গত মনে করেছেন।

সোমনাথ হোড় ও রেবা হোড় 'পরিচয়'-এর দীর্ঘদিনের বন্ধু। আধুনিক শিল্পধারার জটিল পথে তাঁদের সাম্প্রতিক পদচারণার সংবাদও 'পরিচয়'-পাঠকদের অজানা নয়। এই শিল্পী-দম্পতির পাঁচটি চিত্রকর্ম (যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪, ৫) এই প্রদর্শনীর সম্পদ। তাঁদের পথসন্ধান কত পরিণত হয়েছে বিশেষত শ্রীমতী হোড়ের 'ট্রায়ো' ও 'এ ড্রিঙ্ক' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রকাশ কর্মকার গত বছর 'ফুটপাত প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা করে বিশেষ আলোচনা ও অভিনন্দনের পাত্র হয়েছিলেন। সমাজ-সচেতন ও শিল্পনিষ্ঠ এই তরুণ চিত্রকরের কাছে আমরা অনেক আশা রাখি। বিষয় নির্বাচনে, রেখা বিন্যাস ও রঙের ব্যবহারে ইনি যে প্রচণ্ড ভাইটালিটি অথচ নৈর্ব্যক্তিক, কখনো শান্ত সুষমার পরিচয় দেন, তা সাম্প্রতিক শিল্পীদেরও অভিনিবেশের দাবি রাখে।

'অশ্ব-চিত্রাবলী'র একক প্রদর্শনী করে গত বছর সুনীল দাসও শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অত্যন্ত তরুণ বয়স্ক এই শিল্পী এবারও অশ্বকেই তাঁর বিষয় রেখেছেন। সুনীল দাস ক্ষমতাবান। বিশেষত কম্পোজিশন এঁর শক্তিশালী। কিন্তু এবার শিল্পী নিজেকে অতিক্রম করতে পারেন নি। অবশ্য তুলনায় এক বছর খুবই সামান্য সময়।

সুকান্ত বসু (৬), দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মিত্র (১৫), সনৎ কর (১৯), অনিলবরণ সাহা (২১, ২২), অরুণ বসু (২৮, ২৯), কমলা রায়চৌধুরী (৩৩, ৩৪), বিজন চৌধুরী (৩৬) ও অরুণাভ দত্তের ৪২ সংখ্যা-চিহ্নিত ছবি সম্পর্কে পৃথক ও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। বিশেষত দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কনফারেন্স' এবং অরুণাভ দত্তের 'ক্রিমসন নাইট'-এ যথাক্রমে কল্পনা ও রঙের মায়া আছে। কমলা রায়চৌধুরীর মানসিকতা অত্যন্ত পরিণত। অনিলবরণ সাহার বওটি এ প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ-কর্ম। শৈলেন মিত্রের 'কোক্ সিঙ্গা'র এক অন্য তাৎপর্য পেয়েছে। সনৎ করের স্বপ্নের ফুলগুলিও সুন্দর।

১৭, ১৮, ২০, ২৭ ও ৪৩ সংখ্যক চিত্রকটি সম্পর্কে নানা সংশয় জাগে। 'স্টেপস্' ছবিটি দেখলে গগন ঠাকুরের সেই আশ্চর্য সিঁড়িগুলির কথা মনে পড়ে এবং তুলনায় এটিকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়। পোর্ট্রেট-এর অভাব অনুভব করেছি। কাঠখোদাইয়ের নিদর্শনটি (৪০) মন ভরায় না।

ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি ছবির ভীড়ে বা বৈশিষ্ট্যের অভাবে যেন চাপা পড়ে গেছে। উমা সিদ্ধান্ত (২), শর্বরী রায়চৌধুরী (৮) ও রঘুনাথ সিংহের ৯ ও ১০ সংখ্যক কাজ ভালো লেগেছে।

সবশেষে উদ্যোক্তাদের কাছে একটি নিবেদন। প্রদর্শিত চিত্র ও ভাস্কর্যের যে মূল্য তাঁরা ঘোষণা করেছেন তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। অথচ তরুণ শিল্পীদেরও জীবিকার সমস্যা আছে। আপাতত এর সমাধান হয়তো ঘন ঘন ও নিয়মিত 'ফুটপাত প্রদর্শনী'তেই সম্ভব। সৃষ্টির পসরা নিয়ে মানুষের কাছে যদি প্রায়ই তাঁরা আসতে পারেন তাহলে দেশবাসীরও ছবি দেখা, ছবি কেনার অভ্যেস হয় ; শিল্পীদেরও বছরে একবার প্রদর্শনী করে একটি কি দুটি ছবি বিক্রির ক্ষীণ সম্ভাবনার সুযোগ নেবার জন্য চিত্রের অর্থ মূল্য এত বেশি রাখতে হয় না।

আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ

আন্দামানে একটি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। প্রতিনিধিদের দেশ-ভ্রমণ ও রাজকীয় আপ্যায়নের সুযোগ দানের জন্য 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর (অধিকারী—দেবেশ দাস) উদ্যোক্তারাও তৎপরতার অভাব দেখাবেন না। সম্প্রতি কলকাতায় তামিল সাহিত্যিকদেরও একটি উল্লেখ্য অধিবেশন হল। শীতের মরশুমে দেশের নানা জায়গা জুড়ে ছোট-বড় নানা ধরনের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন চলবে।

কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (২-৪) বোম্বাইয়ে যে নিখিল ভারত আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে—বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতি, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ তাৎপর্যটি অন্য দশটা সম্মেলনের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার নয়। এই সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে লেখকদের একটি কনভেনশনও অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে এশীয় লেখক সম্মেলন এবং ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে তাসখন্দে এশীয়-আফ্রিকীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়ে গেছে। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিয়মিত ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য ও তাসখন্দ সম্মেলনে ঘোষিত হয়। দিল্লীতে গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে (৩-৪) নিখিল ভারত আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতির এক অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় লেখকদের একটি স্থায়ী সংগঠন গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আফ্রো-এশীয় সংহতি রক্ষার কাজে সাহিত্যিকদের ভূমিকার গুরুত্ব আমরা সর্বদাই উপলব্ধি করি। বাংলাদেশের প্রগতিকামী লেখক, শিল্পী, সংস্কৃতি-কর্মী ও জনসাধারণের পক্ষে আমরা এই বোম্বাই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। আমাদের বিশ্বাস বহু আকাঙ্খিত একটি নিখিল ভারত লেখক সংগঠনের ভিত্তি এই সম্মেলনেই স্থাপিত হবে এবং আগামী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসরে উপনিবেশবাদের অবসান, স্থায়ী শান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের বলিষ্ঠ দাবিতে এই লেখক সংঘ তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করে শতবার্ষিকী বৎসরকে আরো এক ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করবেন।

সোভিয়েত পুস্তক প্রদর্শনী

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থ দূতস্থানের যুগ্ম উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুট হলে সোভিয়েত-পুস্তকাবলীর একটি নির্বাচিত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত দুই সহস্রাধিক পুস্তকের এই প্রদর্শনীতে প্রাক্ ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়া, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের লেখকদের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার সমাবেশ থাকবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতার বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পরিচয় (যার কিছু কিছু নিতান্ত সহজলভ্য নয়) এই গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যাবে। রুশ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত বিদেশী পুস্তকের অনুবাদ এবং ইংরিজি ও ভারতবর্ষীয় ভাষা-সমূহে অনূদিত রুশ পুস্তকের নানা নিদর্শন এই প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করবে।

রুশ-ভারত মৈত্রী বর্ধক ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির এই উদ্যোগ ও সোভিয়েত দূতাবাসের এই উদ্যমকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

বহু প্রতীক্ষিত 'গঙ্গা' মুক্তিলাভ করেছে। এই কালোপযোগী, দিগন্ত-বিস্তারী ও অসামান্য শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসেছেন। নিউ এম্পায়ার হলে জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'কন্‌ফেশন্‌স্ অফ ফেলিক্স ক্রুল' ছবিটি অশ্লীলতার অভিযোগে সেনসার বোর্ড আটকেছেন শুনে ফিল্ম পত্রিকা, বম্বের চিত্র ও সিনেমা পোস্টার দেখতে অভ্যস্ত অনেকে সত্যই বিস্মিত হয়েছেন। বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র জগতের শিল্পী, কুশলী ও শ্রমিকদের পক্ষে এঁদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন। 'জার্মান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' যুগ্মভাবে শিল্পীদলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ে আমরা দ্রুত আন্তর্জাতিক ও রসবোদ্ধা হয়ে উঠেছি। অতীতের কয়েকটি ফিল্ম ফেস্টিভাল, শিশুদের চলচ্চিত্র-উৎসব একাধারে আমাদের দর্শক ও চলচ্চিত্র জগতকে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র বিষয়ে যে নবজাগৃতির সূচনা দেখা গিয়েছে এবং আমরা একে একে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদারের মতো পরিচালক লাভ করছি—তার পেছনে এই ঘটনাগুলির অবদান সামান্য নয়।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত দেশের একটি সংবাদ দৈনিক পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি। হয়তো খবরটি আমাদের চলচ্চিত্রানুরাগী জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে।

'সোভিয়েত দর্শকদের জন্য আফ্রিকান চলচ্চিত্র

মস্কোর "জাতিসমূহের মৈত্রী ভবন"-প্রেক্ষাগৃহে ইদানীং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নিয়মিতভাবে দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া সর্বসাধারণের জন্যেও মস্কোর সেনট্রাল সিনেমা হাউসে আজকাল প্রায়ই আফ্রিকান ফিল্ম দেখানো হয়।

আফ্রিকার সদ্যমুক্ত দেশগুলি সবেমাত্র স্বাধীনভাবে নিজেদের দেশের জীবন নিয়ে ফিল্ম তোলা শুরু করেছে। ফিল্ম ষ্টুডিওগুলি যান্ত্রিক উপকরণে ও অন্যান্য ব্যবস্থার দিক থেকে এখনও খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। স্বভাবতই কারুকৌশলের দিক থেকে এইসব ফিল্ম খুব উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই সেই অভাবকে পূর্ণ করেছে আফ্রিকান জীবনের বর্ণবহুল বৈচিত্র্যের আশ্চর্য বাস্তব চিত্রণ। আফ্রিকার জনগণের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহেই সোভিয়েত দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে বিপুল সংখ্যায় এইসব ছবি দেখেন।

সেনট্রাল সিনেমা হাউসে আফ্রিকান চলচ্চিত্র দেখানো হবে বলে সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে যায়।

সম্প্রতি মস্কোতে প্রদর্শিত আফ্রিকান ফিল্মগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : স্ট্রাগল্ ইন দি ভ্যালী, জামিলা লাভ অ্যাণ্ড টিয়াস (মিশর); দি বয় কুমাসেন্থ, জাগুয়ার (ঘানা); কান্‌ট্রি অফ দি ফিউচার (লাইবেরিয়া); এন্‌কাউন্টার ইউথ হাপিনেস (সুদান)।"

শত-বার্ষিকীর সরকারী আয়োজন

"কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী, তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বহুমুখী কর্মের উপযুক্ত স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য ভারতে ও বিদেশে যে সকল ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেন।

১৯৬১ সালের ৭ই মে রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী দিবসে—নয়া-দিল্লীতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রবীন্দ্র ভবনের উদ্বোধন হইবে। এই ভবনে তিনটি আকাদেমী থাকিবে। তাহার পরের দিন প্রধানমন্ত্রী নেহরু কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোস্থিত বাসভবনে রবীন্দ্র মিউজিয়ামের উদ্বোধন করিবেন। উহা সংরক্ষিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

রচনাবলী সংগ্রহ প্রকাশ

সাহিত্য আকাদেমী বিভিন্ন ভাষায় ৮ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশ করিবে। রবীন্দ্রনাথের নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাসমূহ হইতে নির্বাচন করিয়া এই নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষায় ১৩ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা করিতেছে। ইহা ৭৫ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

ভারতে ও বিদেশের অ-বাংলাভাষী কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথের ১৮টি প্রবন্ধ সংকলিত "টুওয়ার্ডস ইউনিভার্সাল ম্যান" বা "বিশ্বমানবের দিকে" শীর্ষক আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। "ইউনেস্কো" বা জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থাও কবির একটি নির্বাচিত রচনা গ্রন্থ প্রকাশ করিবে।

অধ্যাপক কবীর জানান যে, এই সকল রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাকিন

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ হইতে যে সকল অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে বহুল পরিমাণে মতৈক্য দেখা গিয়াছে।

রবীন্দ্র চিত্র-কলার প্রতিলিপি

ললিতকলা আকাদেমী রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ৪০টি ছবির (পেন্টিং-এর) প্রতিলিপি সহ একটি অ্যালবাম প্রকাশ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। এই জনপ্রিয় সংগ্রহ ছাড়া শতবার্ষিকী কমিটি লণ্ডনের গ্যানিমেড প্রেস হইতে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ৪০টি ছবির কলোটাইপে ছাপা প্রতিলিপিসহ একটি পোর্ট-ফোলিও প্রকাশ করিবে। এই প্রতিলিপিগুলি প্রায় মূল চিত্রের অনুরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার মূল্য হইবে ১৫ টাকা এবং ইহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিউজিয়ামগুলিতে রাখা হইবে।

সংগীত ও নাটক আকাদেমী একশত রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি সংকলনের জন্য কাজ শুরু করিয়াছেন।

আসাম এবং গুজরাট ব্যতিরেকে প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজধানীতে রবীন্দ্র জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আসাম এবং গুজরাটে এই নাট্যশালা যথাক্রমে গোহাটী ও আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলকে রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনায় উৎসাহ দান করা হইতেছে। ইহাদের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় বহন করিতেছে শতবার্ষিকী কমিটি। রবীন্দ্র রচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য-শৈলীর মাধ্যমে 'ব্যালে' সমূহ প্রয়োজিত হইবে।

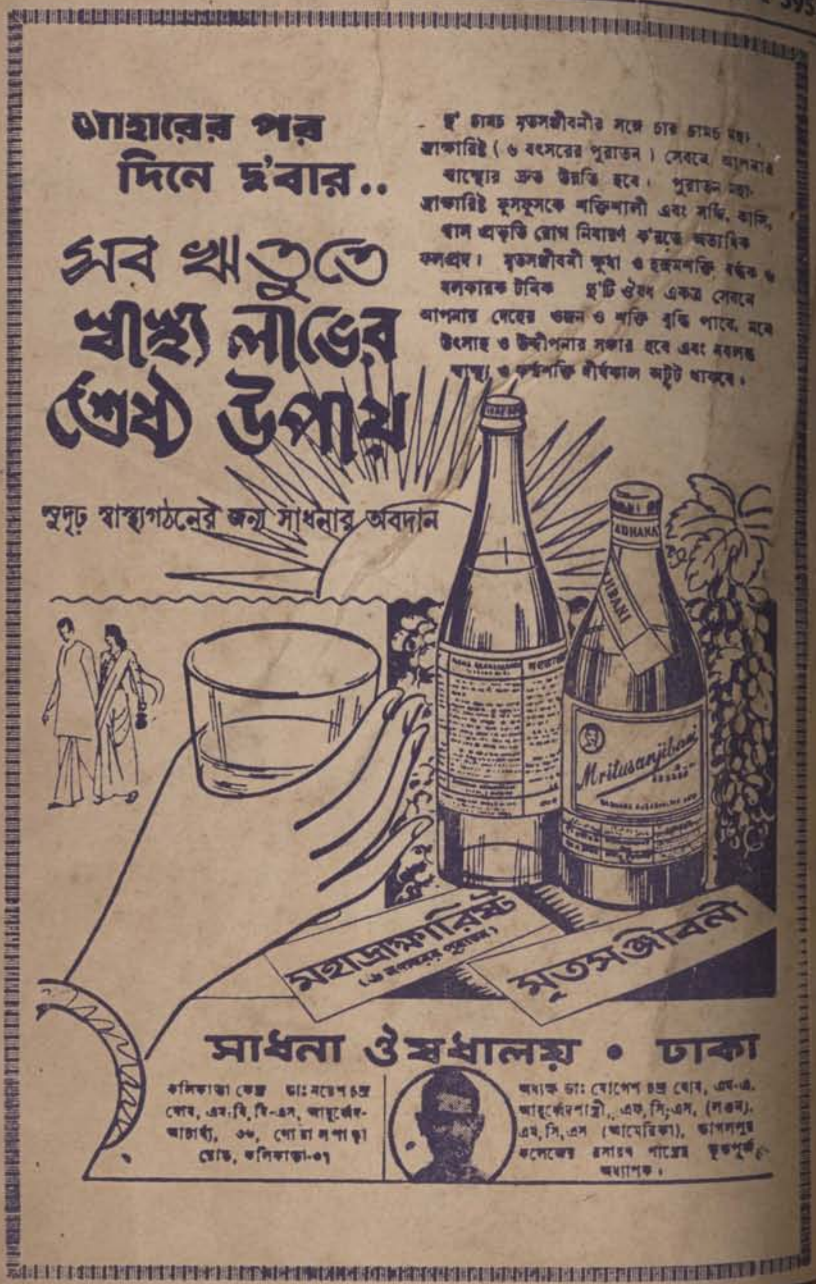
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে নয়াদিল্লীতে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পিছন দিকে একটি বিরাট মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ নির্মিত হইবে এবং ইহার আংশিক ব্যয় শতবার্ষিকী তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

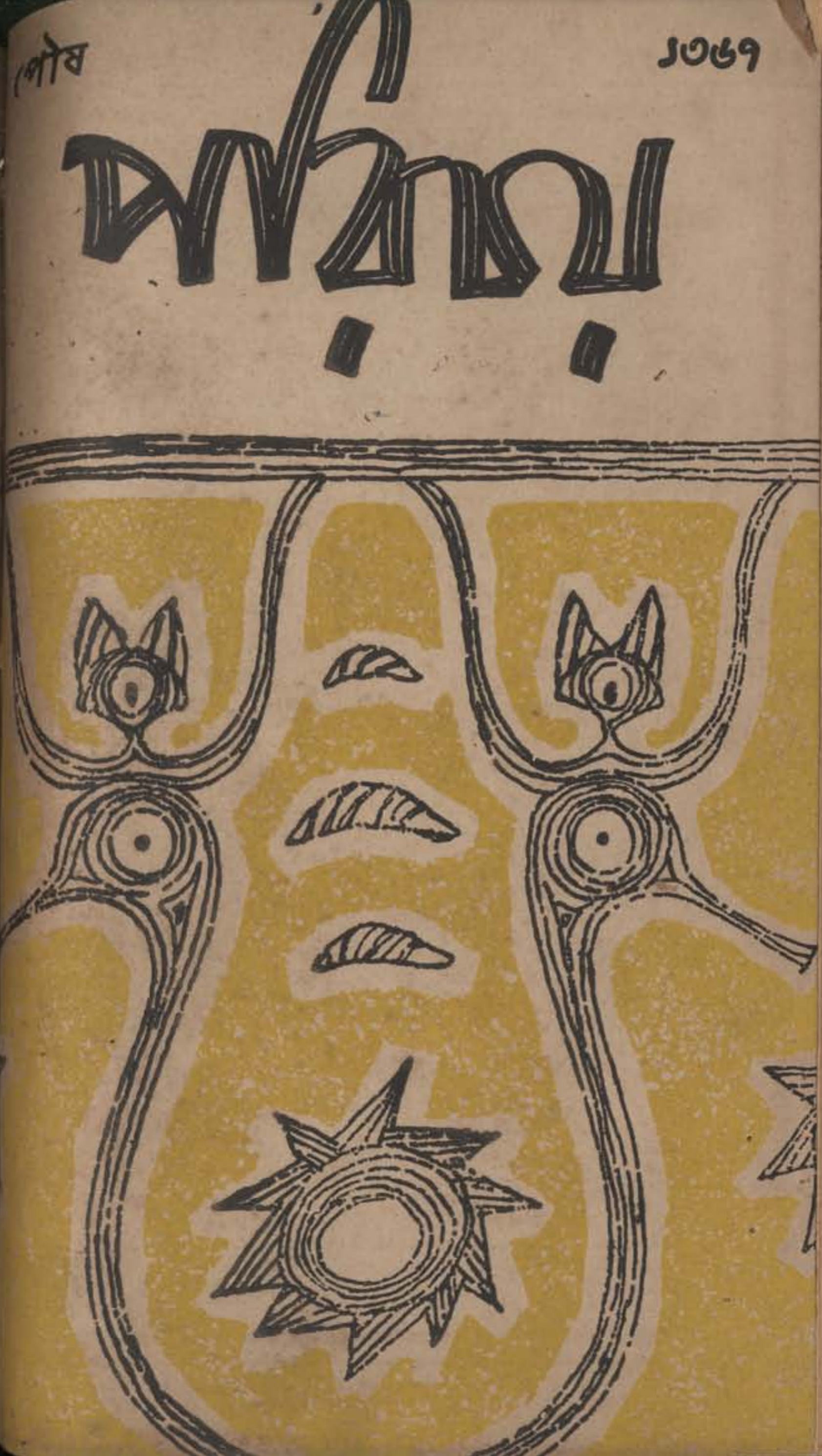
আগামী বৎসর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে নভেম্বর মাসে (১৯৬১) একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।"

এই সংবাদটি উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব সমিতি' এবং 'শতবার্ষিকী লেখক-সংস্থা'র যে ঘোষিত উদ্যোগ—তার প্রতিও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'ষ্টেটস্‌ম্যান'-এর বিবরণানুযায়ী দেখা যায়—নয়া দিল্লীর 'সাহিত্য আকাদেমি' ভারতের 'ফ্রীডম্ অব্ কালচার' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে নয়াদিল্লীর উৎসবে বিদেশীয় অতিথিদের নিমন্ত্রণ করছেন, এ কথাও হুমায়ুন কবীর সাহেব নাকি জানিয়েছেন। সংবাদটি সত্য হলে জিজ্ঞাস্য—একমাত্র 'ফ্রীডম্ অব্ কালচার'-চক্রই কি পরামর্শ দিচ্ছে? সেই চক্রটিকে এই অধিকার কে দিলে? কোন্ গুণের জন্য?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়




পৌষ
পরিচয়
১৩৬৭

নিয়েই এই প্রকাণ্ড উপন্যাস। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গিয়ে যখন পৌঁছানো গেল তখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয়—এই কাহিনীর মহাপরিণতিতে। হৃত-ভাগিনী আনার পতনের কাহিনী পড়ে শত সত্ত্বেও মানতে হয়—দণ্ডের মালিক বিধাতা হতে পারেন, কিন্তু সমাজ তাকে দণ্ড দেবার কে? বিবাহচ্ছেদের কথা, পতনের কাহিনী, অনুতাপ নিরাশার কাহিনী সাহিত্যে অজস্র আছে। কিন্তু এ গাম্ভীর্য, এ ব্যাপ্তি, এ সত্য নিষ্ঠা, আর জীবনাবেগ, কোন্ কাহিনীতে মূর্ত হয়েছে? বিচক্ষণ সমালোচকগণ এর প্রতিটি অধ্যায় ও প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন—টলস্টয় কী মহৎ শিল্পী—সামান্য একটি কথা, তুচ্ছ একটি ঘটনার মধ্যেও কতখানি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তিনি বপন করে রেখে যান। সেরূপ পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে লেভিনকে শুধু টলস্টয়ের ভাবাদর্শের বাহন মনে হয় না। নিশ্চয়ই লেভিন টলস্টয়ের প্রতিলিপি—কিন্তু গ্রন্থের প্রয়োজনেই তার প্রকাশ। স্বাভাবিক সুস্থ দাম্পত্য জীবনের প্রতিশ্রুতি অন্যতর একই জীবনকে ভারসাম্য দান করছে।

গ্রন্থের আকার একটা তুচ্ছ বিষয় নয়। কিন্তু শুধু আকারের উপর উপন্যাসের এপিক-ধর্ম নির্ভর করে না। বহু পাশ্চাত্য পাঠকই 'কসাক' বড় গল্পটিতে হোমারীয় প্রশান্তি ও মহিমা আবিষ্কার করে সম্ভ্রমবোধ করেছেন। অথচ এটি প্রথম বয়সের লেখা, তখনো টলস্টয়ের মন তাঁর মতের সন্ধান পায় নি। 'পুনর্জীবন' শেষ দিককার লেখা—মতবাদ ছাড়া টলস্টয়ের মনে তখন কোনো কথা স্থান পায় না। সুদীর্ঘ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য তারস্বরে প্রচারিত। তবু তার প্রকাশ-মহিমা, তার নিষ্কম্প জীবন-নিষ্ঠা, তার তীক্ষ্ণ সর্বত্রগামী দৃষ্টি—দেখতে দেখতে প্রতিপদে স্বীকার করতে হয়—এ শুধু উপন্যাস নয়। এ জীবনের একটা উদ্বোধন। বহির্বিশ্বের বার্তা সে এই বিশ্বের পৃষ্ঠে বহন করে এনেছে।

'ইভান-ইলিচের মৃত্যু' একেবারে অন্য জাতের গল্প—এক অর্থে তুচ্ছ দৈনন্দিনতার নিয়মে-বাঁধা জীবনের তা ব্যঙ্গরূপ—ইভান ইলিচ্-এর পত্নী, বা কারও পক্ষে সে মূলতঃ আবশ্যকীয় নয়। দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজন, তাসখেলার সময়, বীমার টাকার হিসাব, প্রভৃতি কোনো জিনিসই ফেলে রাখা যায় না এক সন্ধ্যার মতো তার মৃত্যু-শোকে। নিষ্করুণ এই সাক্ষ্য জীবনের। জীবন এরূপই, এরূপই বিশেষ করে সমাজ। এ গল্পকেই জেমস্ জয়েস্ বলেছেন—বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ঠিক এই কথাই মনে হয় 'মানুষের কতটা জমি প্রয়োজন'এর মতো লোক-কথা জাতীয় গল্প পড়লে। যতখানি জমি লোকটা ছুটে সূর্যাস্তের পূর্বে পেরিয়ে আসবে তাই হবে তার সম্পত্তি। সারা দিন লোভের বশে লোকটা ছুটছে—কোনো জমিই কি বাদ দেওয়া যায়? ছুটে ছুটে সূর্যাস্তের মুখে সে মুখ থুবড়ে পড়ল চিরজন্মের মতো। দেখা গেল সাড়ে তিন হাতের বেশি জমি তার প্রয়োজন হল না। কে বলেছেন মনে পড়ে না—এটি পৃথিবীর মহত্তম পৌরাণিক কাহিনীর সমতুল্য। নীতি শিক্ষার স্পর্শ এর গায়ে, যেমন নীতি-উক্তি দিয়েই সূচনা আনা কারেনিনা'র—'দণ্ডদাতা বিধাতা' —সমাজ নয়। কিন্তু এ নীতি জীবনসত্যের অঙ্গ হয়ে উঠে সমস্ত কাহিনীকে দিয়েছে গভীরতা—রুশ উপন্যাসের যা প্রধান দান।

বাঙলার শিক্ষালয়

টলস্টয় প্রমুখ রুশ উপন্যাসিকদের দানে এরূপে উপন্যাসের প্রধান ধারায় এই সত্য দুটি গ্রাহ্য হয়েছে। উপন্যাস এ যুগের মহাকাব্য হতে পারে; এবং মহাকারের উপন্যাস বাস্তবের রূপায়ণ হয়েই শেষ হয় না, তা জীবনদর্শনও। রুশধারা ছাড়াও যে উপন্যাসের বহুধারা আছে তা অবশ্য স্বীকার্য। হেনরি জেমস্, কনরাডকে আমরা জানি। তুর্গেনিফকেই বা সেই সঙ্গে গণনা করব না কেন? হার্ডিও অতলস্পর্শী। তাছাড়া, জেমস্ জয়েস্ ও প্রুস্ত যে আধুনিক জীবনের দুই সিদ্ধ শিল্পী তাও আজ স্বীকৃত। তথাপি মোটের উপর বলা যায় —রুশ উপন্যাস যে দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল পাশ্চাত্যদেশীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা অনেকেই সেই দিগন্তের যাত্রী।

গুরুর শিক্ষাগুরু

স্বভাবতই এক্ষেত্রে আমাদের উপন্যাসের শতবর্ষীয় ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। এখানে তা আলোচনার মতো পরিসর নেই। না হলে নিশ্চয়ই টলস্টয় প্রসঙ্গে বাঙলা উপন্যাসের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, শেক্সপীয়র বা টলস্টয়ের মতো প্রতিভার আয়তন পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। (প্রসঙ্গত, টলস্টয়ের বিবেচনায় শেকস্‌পীয়ার মোটেই ভাল নাট্যকার নন। টলস্টয় তা বললেও আমরা জানি শেক্‌সপীয়ার তবু শেক্‌সপীয়ার। আর, নিজের কীর্তিকে নস্যাৎ করতে চাইলেও 'আর্ট কী' সত্ত্বেও টলস্টয়ও থাকবেন